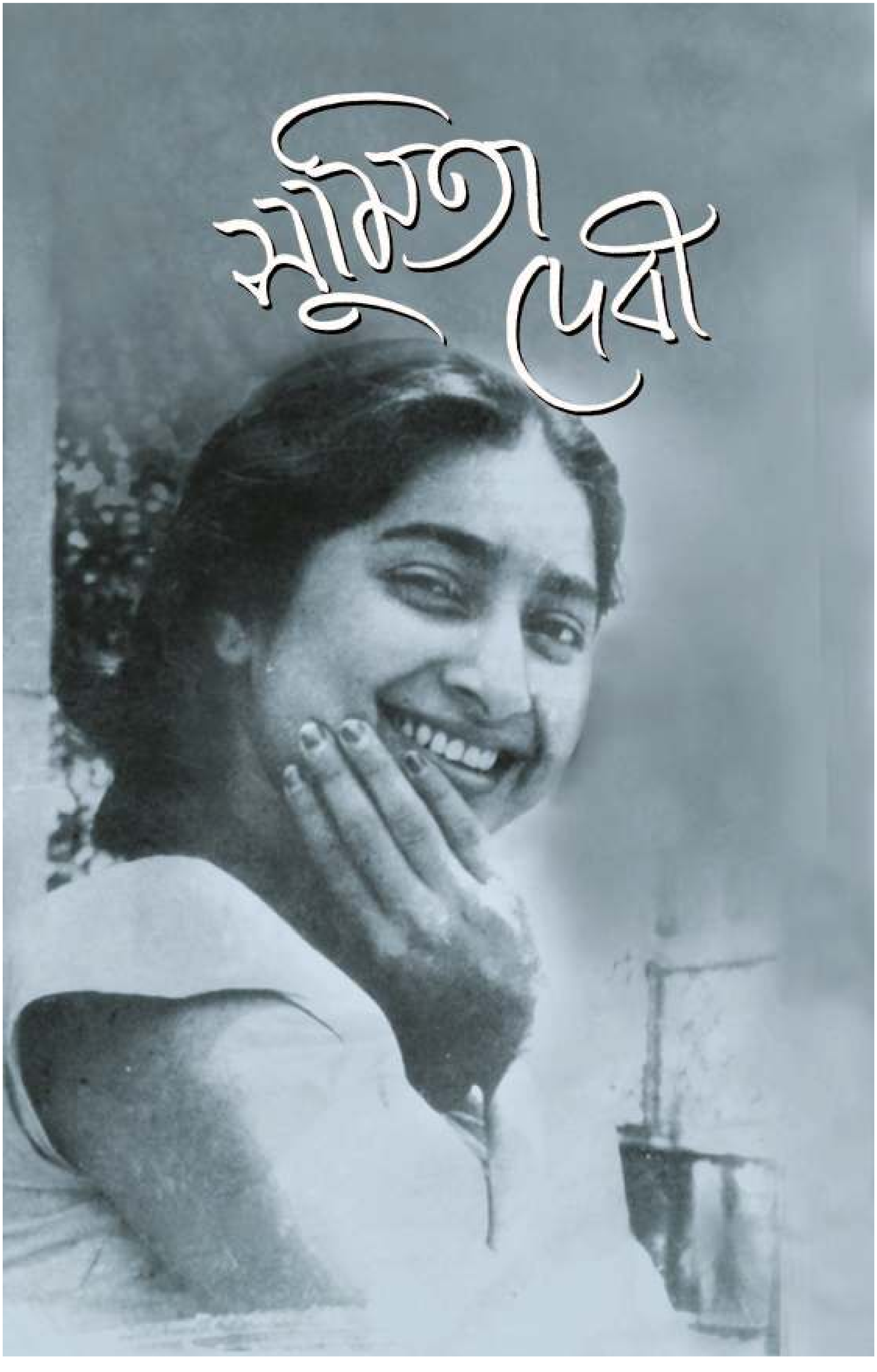
সুমিত্রা দেবী

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রকাশনা প্রকল্প, ২০০৮

জীবনী গ্রন্থ

সুমিতা

মোঃ ইশতিয়াকুর রহমান ভুঁইয়া (অব্যয় রহমান)

সূবর্ণগ্রাম, বাড়ী# ৩৩/৪, রোড জিয়া সরণী-৮,
পলাশপুর, ঢাকা-১২৩৬। ফোনঃ ০১৫৫২৩৫৬৭৬৪

সূচীপত্র

জীবন কথা

বাল্য জীবন ও শিক্ষা জীবন

সংসার জীবন

মুক্তিযোদ্ধা, কর্মজীবনঃ অভিনয়, মঞ্চ, বেতার, টেলিভিশন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শেষ জীবন-মৃত্যু, স্মরণ ও সম্মাননা

রচনা ও অন্যান্য সৃষ্টি-পরিচয় এবং সমকালীন প্রতিক্রিয়া

সুমিতা দেবী চলচ্চিত্রের ফার্স্ট লেডী ও অভিনীত অন্যান্য ছবি

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য

সুমিতা দেবী সম্পর্কে চলচ্চিত্র বোদ্ধাদের উদ্ধৃতি ও মূল্যায়ন

বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সুমিতা দেবী সম্পর্কে অভিমত ও

পরিশিষ্ট

জীবন-কথা

চলচ্চিত্র এক মোহময় স্বপ্নের দেশ। সময়ের আবর্তে এ স্বপ্নের আকাশে কত তারা জ্বলে আর কত তারা নেভে! বাংলাদেশের চিত্রাকাশেও তেমনি এক তারার নাম সুমিতা (১৯৩৬-২০০৪)। রক্ষণশীল বাঙালী সমাজে অভিনয় শিল্প আকর্ষণীয় হলেও এতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। ১৮৯৬-৯৮ খৃস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার কোলকাতা ও ঢাকায় বিদেশ থেকে আমদানীকৃত চলচ্চিত্রের প্রদর্শণ শুরু হয়। আর ১৯০১ খৃস্টাব্দে পথিকৃৎ বাঙালী চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) এর মাধ্যমে শুরু হয় প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ। তাঁরই মাধ্যমে কোলকাতায় প্রথম বাঙালী চলচ্চিত্র অভিনেত্রী কুসুম কুমারীর আবির্ভাব ঘটে চলচ্চিত্রের পর্দায় 'আলী বাবা' নাটকের খন্ড চিত্র দৃশ্যে। অতঃপর প্রথম মহাযুদ্ধের পর অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কোলকাতায় চলচ্চিত্র নির্মিত হতে থাকে আর সেই সঙ্গে বাঙালী চিত্রাভিনেত্রীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ১৯৩১ খৃস্টাব্দে নওয়াব পরিবারের উদ্যোগে ঢাকায় নির্মিত প্রথম নির্বাক চিত্র 'দি লাস্ট কিস' বা 'শেষ চুম্বনে' ভদ্র ঘরের কোন মেয়ে অভিনয় করতে রাজী হননি। এ ছবির অভিনেত্রী লোলিটা, চারুবালা, দেবী, হরিমতিকে আনা হয় ঢাকার বিভিন্ন পতিতালয় থেকে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় নির্মিত প্রথম পুর্ণদৈর্ঘ্য সবাক ছবি 'মুখ ও মুখোশ' এর প্রধান নায়িকা পুর্ণিমা সেন গুপ্তাকে আনা হয় চট্টগ্রামের যাত্রা মঞ্চ থেকে; রহিমা বিলকিস বারিকে আনা হয় ঢাকার মঞ্চ থেকে। অন্যদিকে এ ছবির সহ নায়িকা জহরত আরা ও পিয়ারী বেগম নাজমা ছিলেন ঢাকার কলেজ ছাত্রী। দেখা যাচ্ছে ঐ সময় সামাজিক বিধি নিষিধের বৃত্ত ভেঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প ও সংস্কৃতি মাধ্যম চলচ্চিত্রে জড়িত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে এফডিসিতে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র 'আসিয়া'র নায়িকা হয়ে আসেন সুমিতা দেবী। সুমিতাও ছিলেন শিক্ষিত, রুচিশীল ও সংস্কৃতি পরিবারের মেয়ে এবং একরাজনৈতিক কর্মীর স্ত্রী। চিত্রজগতে তাঁর জড়িত হওয়ার ব্যাপারটি একদিকে যেমন নিঃসন্দেহে আধুনিক দৃস্টিভংগীর পরিচায়ক তেমন পেশাগতভাবে প্রতিভা বিকাশের জন্য স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষেত্রে বাঙালী নারীর অগ্রযাত্রারও নিদর্শন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের 'ফার্ষ্ট লেডী' বিশিষ্ট চিত্র নায়িকা, মঞ্চ, বেতার ও টেলিভিশনের অভিনেত্রী, চিত্র প্রযোজিকা, মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজকর্মী সুমিতা দেবীর জন্ম বৃহত্তর ঢাকার বর্তমানে মানিকগঞ্জ জেলার দক্ষিনখল্লি ধানকোড়া গ্রামে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি।১ সুমিতার আসল নাম হেনা ভট্টাচার্য। পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিলুফার নাম ধারণ করেন। ১৯৫০ দশকের মধ্যভাগে ঢাকার চলচ্চিত্র জগতে প্রথম জড়িত হওয়ার সময় তিনি পর্দা নাম সুমিতা গ্রহন করেন। অন্য একটি সূত্রে তাঁর আরও একটি নাম পাওয়া যায়, এটি সোমা লাহিড়ী। জানা যায়, হেনা লাহিড়ী 'স্মাগলার' নামক একটি নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে সোমা লাহিড়ী নাম গ্রহন করেন।২

হেনা ভট্টাচার্যের বাবার নাম কুলেশ্বর ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম শিবানী ভট্টাচার্য। তাঁরা ব্রাহ্মন বংশের লোক। তাঁর পিতা ছিলেন দক্ষিণ খল্লি জমিদারী এস্টেটের হিসাব রক্ষক। তাঁর ঠাকুরদার নাম রমনীমোহন ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন সুপরিচিত পণ্ডিত। সুমিতার মার গর্ভে বার জন সন্তানের জন্ম হয়। এর মধ্যে ছয় জন অকালেই মৃত্যু বরণ করে। বেঁচে থাকেন ছয় ভাই বোন।৩ সুমিতার পিতার সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তাঁর জীবনে ছিল বাবার প্রভাব। লিখেছেন তিনি ঃ

'আমার জীবনে আমার বাবার প্রভাবের কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। তাঁর ব্যক্তিত্ব, মেধা, শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে সব সময় প্রেরণা যোগাত। তার কথা আমার কাছে ছিল বেদবাক্যের মতো। তিনি যদি বলতেন . তুমি আগুনে ঝাপ দাও আমি দিতে প্রস্তুত থাকতাম। আমার সেই বাবার আকস্মিক মৃত্যু আমাদের পরিবারকে নিদারুন শোকাভিভুত করে। আর আমার জীবনে বাবার অন্তর্ধান শুধু শোকগ্রস্তই করেনি, একা, নিঃসহায়ও করেছিল'।৪

সুমিতার এক বোনের নাম অনিমা ভট্টাচার্য। তিনি একজন অভিনেত্রীও । তিনি 'কখনো আসেনি' (১৯৬১) চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। পরে তিনি কোলকাতায় চলে যান।

সুমিতা দেবীর জীবন নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনায় ভরপুর উপন্যাসতুল্য। তাঁর জীবনের বিভিন্ন কথা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'আমার কথা' শিরোনামে তাঁর নিজের লেখা সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী যা পাক্ষিক 'তারকালোকে' ১৫-৩০ জুন ১৯৮৫ এবং একই পত্রিকার ঈদ সংখ্যা ২০০১ এ আরো তথ্য সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হয়। সেই আত্মজীবনীমূলক স্মৃতি কথা থেকে সুমিতার জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

সুমিতার পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে জানা যায় তাঁর নিজের লেখায় । তিনি লিখেছেন ঃ

' আমাদের পরিবার ছিল একান্নবর্তী। চারটি শরীক ছিল অভিন্ন প্রাণ। পারিবারিক কোনো জটিলতা ছিল না। পরিবারে যারা হর্তাকর্তা অর্থাৎ আমার বাবা-কাকারা চাকরির খাতিরে গ্রামের বাইরে থাকতেন। পূজা-পার্বন কিংবা কোন উৎসব উপলক্ষ্যে সবাই একত্রিত হতেন গ্রামের বাড়িতে। আর তখন মৃত প্রায় আমাদের বাড়ির শুধু নয়, সারা গ্রাম যেন উৎসবের আমেজে মুখর হয়ে ওঠত। বাবা ছিলেন আমুদে সংস্কৃতিসেবী মানুষ। নিজে নাটক করতেন। মা গান গাইতে পারতেন। আমাদে গ্রামে বা পাড়ায় নাট-যাত্রা করতে হলে, প্রদান উদোক্তার ভূমিকা নিতেন বাবা। এ ছাড়াও আমাদের বাড়িতে প্রায়ই বসত গান বা কীর্তনের আসর। তখন কতইবা আর বয়স । দেখতাম শুনতাম। উপভোগ করতাম।৫

সুমিতার বাবার কর্মস্থল ছিল ঢাকার বাংলা বাজারে। পরে তিনি পরিবারের সংগে গ্রামের বাড়ি ছেড়ে ঢাকা চলে আসেন। ঐ সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে গ্রামের পরিবেশ ছিল অস্থির। ঢাকায় এসে তিনি নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। ক্রমে মুছে যেতে থাকে গ্রামের স্মৃতি। ঢাকায় তাঁদের বাসার পরিবেশও ছিল সংস্কৃতিমুখর। তিনি লিখেছেন ঃ

'ঢাকায় আমাদের বাসার পরিবেশও ছিল সংস্কৃতিমুখর। আগেই বলেছি, বাবা নাটক ও সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষ ছিলেন বলে, আমাদের বাসায় সব সময় আসা-যাওয়া করতেন তখনকার নাট্যামোদী মানুষ-জন। এছাড়া পূজা-পার্বণ উপলক্ষে গান-বাজনার আয়োজনতো ছিলই। ঠিক এ সময়ই একটা ঝোঁক বা প্রবণতা আমাকে পেয়ে বসে। বলা যায়, নেশার মতো। সিনেমা দেখা। প্রথম কি সিনেমা দেখেছিলাম, সে কথা মনে নেই। কিন্তু সে ছিল এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। তারপর কত যে সিনেমা দেখেছি, কখনো বান্ধবী বা বোনের সঙ্গে, কখনো পরিবারের সদস্যদের সংগে। সেসবের হিসেব নেই। আর সিনেমা দেখে এসেই নায়ক-নায়িকাদের চলাফেরার হুবুহু অনুকরণ করে, তাঁদের উচ্চারণ ভঙ্গি নকল করে বাসার ছোট বড় সবার সামনে উচ্ছ্বসিত আবেগে দেখা সিনেমার গল্প নিবৃত্ত করতাম। সবাই খুশি হতো। মুগ্ধ হয়ে শুনত। হাসিতে ভেঙ্গে পড়ত। তখন আমার বয়স আর কতইবা । ১৩ কি ১৪। যৌবন ছুঁই ছুঁই করছে। কিন্তু সব কিছুই আমার অজান্তে।

আমরা বাংলাবাজারে যেখানে থাকতাম, বুড়িগঙ্গা নদী সেখান থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। আমি আমার বন্ধীরা দলবেঁধে প্রায়ই সেখানে স্নান করতে যেতাম। সাঁতার কাটতাম। নানা খুনসুটি করতাম । কিন্তু সেসব নির্মল আনন্দ ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আমার এক বান্ধবী ছিল রেজিনা। বান্ধবীদের মধ্যে ও ছিল একটু ইঁচড়ে পাকা ধরণের। বিকেল হলে বো বান্ধবীসহ বাড়ির ছাদে উঠতাম। বাতাস খেতাম। গল্প গুজব করতাম। আর দেখতাম আমাদের বাড়ি সংলগ্ন ব্যায়াম-গারে পাড়ার কয়েকজন ছেলের নানা রকম প্রাণবন্ত কসরৎ'।৬

শিক্ষা জীবন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সুমিতার পরিবার ছিল শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও রুচিশীল। শৈশবেই তিনি পারিবারিক পরিবেশে পেয়ে ছিলেন আদর যত্ন ও শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ। ঢাকায় চলে আসার পর সুমিতার বাবা তাঁকে বাংলা বাজার গার্লর্স হাই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। পরে তিনি কোলকাতায় চলে যান। কোলকাতা থেকে আসার পর তিনি ম্যাট্রিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেন বলে জানা যায়।৭

প্রেম-বিয়ে ও সংসার জীবন

সুমিতা খুব স্পষ্টভাষী ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের জীবনের প্রেম বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন-সম্পর্কে খোলাখুলি বক্তব্য রেখেছেন। বাংলাবাজারে থাকার সময় এক মুসলমান তরুণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল বলে জানা যায়। তিনি লিখেছেন ঃ

‘একদিন বুড়িগঙ্গায় স্নান সেরে বান্ধবীদের নিয়ে ফিরছি, দেখি সেই ছেলেটি কৃষ্ণের অনুকরণে বাঁশি নিয়ে নয় আমাকে লক্ষ্য করে, দু'হাত একসঙ্গে করে বাঁশি বাজাচ্ছে। আমি বিব্রত বোধ করি। বান্ধবীরা মুখ টিপে হাসে। আমি চলে আসি। রাগ হয়। মন থেকেই। কিন্তু কিছু বলি না।

কিন্তু না, রেহাই নেই। বান্ধবীদের নিয়ে বুড়িগঙ্গা থেকে স্নান ছেড়ে উঠবার অথবা স্নানে নামবার মুখে সেই ছেলেটি এখন প্রায় রোজই কৃষ্ণ সাজে। ফাজলামি করে।

একদিন কড়া মেজাজেই জিজ্ঞেস করি ছেলেটিকে, অত কৃষ্ণ সাজার শখ হয়েছে কেন?

ছেলেটির উত্তর ‘তুমি ভালবাস বলে।’

ওর জবাব শুনে মেজাজ ভীষন বিগড়ে যায়। কড়া কয়েকটা কথা বলে সেদিনের মতো চলে আসি।
ইতিমধ্যে রেজিনার কাছ থেকে জেনেছি ছেলেটির পরিচয়। তাতে রাগ আরো চড়ে যায়। তবু যুবকটি আমার পিছু ছাড়ে না। একদিন হঠাৎ করেই একটা চিঠি পাই। ফুলস্কেপ কাগজে। কয়েক লাইনের একটা চিঠি। খুব গোপনে রেজিনা এনে দেয়। সেই যুবকটি আমাকে লিখেছে। বুক টিপ টিপ করে কাঁপতে থাকে। গলা শুকিয়ে আসে। সবার সামনে চিঠিটা খুলতে ভয় হয়। বাড়ি ভরা লোক। কোথায় যাই? কোথায় খুলি চিঠিটা? ছাদেও যেতে সাহস পাই না। অনেক ভেবে পেয়ে যাই নিরাপদ জায়গা। ছোট্ট ৭ কি ৮ লাইনের চিঠি। পাঁচ ছ'বার করে পড়ি। চিঠির ভাবটা ছিল এই রকমের ঃ অনেক ভেবে দেখেছি, তুমি ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমার জন্যই কৃষ্ণ সাজি। সাড়া দাও। এই ছোট্ট চিঠি পড়ার জন্য সেদিন আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল আমাদের বাড়ির শৌচাগারে। আমি হতবিহবল হয়ে পড়েছিলাম। একজন ব্রাহ্মণের মেয়ের কাছে একটি মুসলমান ছেলের প্রেম নিবেদন, আমার কাছে আকাশ কুসুম ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল সেদিন।

ঘটনার এখানেই শেষ নয় বুড়িগঙ্গায় স্নান বন্ধ করে দেই। ওই ছেলেটির কারণেই। তবু আমার রেহাই নেই। ছেলেটি নাছোড়বান্দা।

আমাদের বাড়ির সামনে ফুলের একটা বাগান ছিল। তাতে ছিল একটা পারিজাত ফুলের গাছ। ছেলেটি এরপর আমার কাছ থেকে তার চিঠির উত্তর না পেয়ে অন্য পথ ধরেছে। আমি যে ঘরে শুতাম, রোজ ভোরবেলা, সে ঘরের দোর গোড়ায় একটি করে পারিজাত ফুল রেখে যেত। আমি বুঝতাম এ সেই নাছোড় প্রেমিকের কাজ। কিন্তু এত যে ঘটনা ঘটে যাচ্ছে আমার জীবনে, নিঃশব্দে, আমার পরিবারের কাউকে তা ঘূর্ণাক্ষরেও জানতে দিইনি। ভয়ে ও অজানা আশংকায়। শুধু রেজিনা জানত।৮

পরে.সেই ভদ্র লোকের সংগে সুমিতার দেখা হয় প্রায় এক দশক পরে নাটকীয়ভাবে। তখন তাঁর ‘আকাশ আর মাটি’ (১৯৫৯) এবং তিনি আরও ২/৩টি ছবির নায়িকা চরিত্রে চুক্তিবদ্ধা’ ।৯

সুমিতার প্রথম বিয়ে হয় মাদারীপুরের রাজনৈতিক কর্মী অতুল লাহিড়ীর সঙ্গে। অতুল লাহিড়ী ছিলেন একজন কমিউনিষ্ট। এছাড়া তার প্রবল শখ ছিল ষ্টিল ফটোগ্রাফিতে। মাদারীপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে ছিল তার ‘লাহিড়ী ষ্টুডিও’। আর দ্বিতীয় বিয়ে হয় চলচ্চিত্রকার সাহিত্যিক জহির রায়হানের সঙ্গে।

জানা যায়, তাঁর বাবার মৃত্যুর পরপরই তাঁদের পারিবারিক অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে। এ অবস্থায়ই তাঁর প্রথম বিয়ে হয় অতুল লাহিড়ীর সঙ্গে। সুমিতা লিখেছেন ঃ

'আমার বিয়ে বলা যায়, একটা ষড়যন্ত্রেরই ফসল। পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বা কলহের ফল..... । আমার সঙ্গে অতুলের বয়সের ব্যবধান ছিল প্রচুর। প্রায় দুদশকের। অতুল তখন দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সত্রে পোড় খাওয়া মানুষ। আর আমি সংসার আর পারিবারিক জীবনে একেবারে আনকোড়া। দেবর ননদরা আমাকে আগলে রাখত। কুটোটির স্পর্শ যেন না লাগে গায়ে সেইভাবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়েই অতুল বেশি ব্যস্ত থাকত। যেদিন অবসর পেতো আমার ছবি তুলত। ছবির পর ছবি। বিভিন্ন ভঙ্গিতে। 'অতুল আমাকে ভীষন ভালবাসত। কিন্তু সেটা ছিল চাপা। রাজনৈতিক কর্মকান্ড আর পেশার পেছনে তার অধিকাংশ সময় চলে যেত। আহার গ্রহণেরও নির্দিষ্ট কোন সময় ছিল না। বেশি রাত করে বাড়ি ফিরত। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে। টুকটাক কথা এরই মধ্যে গভীর ঘুমে হারিয়ে যেত অতুল। আমি দুষ্টুমি করে তাঁর নাকে মাঝে মাঝে সুড়সুড়ি দিতাম। সে জেগে উঠত। আমরা দুজন তখন হাসতাম প্রাণ খুলে। কথা বলতাম । সে ছিল অন্য রকম দিন। অন্য রকম সময়'।১০

তাঁর স্বামী অতুলই তাঁর মধ্যে চলচ্চিত্রের নায়িকা হবার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি যখন চিত্র জগতের সঙ্গে জড়িত হন তখন তাঁর স্বামী অতুল তাঁকে কোলকাতায় চলে যাওয়ার জন্য বলেন। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতান্তর ঘটে এবং পরবর্তীতে তাঁদের দাম্পত্য জীবন ও সংসার ভেঙ্গে যায়। অতুল সুমিতা দম্পত্তির গর্ভে এক ছেলের জন্ম হয়। নাম মিঠু লাহিড়ী।

পরবর্তীতে সুমিতা জহির রায়হানের (১৯৩৫-১৯৭২) সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন ১৯৬১ সালে।১১ পরিচালক এহতেশাম এর 'এদেশ তোমার আমার'(১৯৫৯) ছবিতে নায়িকা হিসেবে কাজ করার সময় ওই ছবির সহকারী পরিচালক জহির রায়হানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়, ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রণয়, পরিশেষে পরিণয়। জহির রায়হানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

'১৯৫৯ সালের কথা। এহতেশাম তখন তৈরী করছেন 'এদেশ তোমার আমার'। জহির রায়হান এহতেশাম এর সহকারী হিসেবে কাজ করছে। এর আগে জহিরকে দেখেছি, কিন্তু চুপচাপ কাজ করত বলে একটু আড়ালে-আড়ালে থাকত বলে ও তখনো আমার নজর কাড়েনি। বা নজরে পরার মতো বিষয় হয়নি। কিন্তু 'এদেশ তোমার আমার' এ কাজ করার সময় দু'জনের কাছাকাছি হওয়ার একটা সুযোগ এল। ছবিটির শুটিং চলছে ঢাকার বাড্ডার কাছাকাছি। জায়গাটার নাম কড্ডা। হাজার কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও জহিরের কাঁধে সব সময় ঝুলত একটা সাইড ব্যাগ। হালকা পাতলা গড়ন। কিন্তু চোখে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য । আকর্ষণ করার মতো । কিন্তু জহির শূটিংয়ে কোন রকম ব্রেক হলেই ইউনিটের লোকজনের কাছ থেকে একটু দরে, নিরালা জায়গায় গিয়ে বসে থাকত। একদিন এমনিই হাঁটতে হাঁটতে জহিরের কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি জহির সাহেব, একা একা কেন? জহির যেন একটু ব্রিবত হলো। সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল'আপনি যান আমি আসছি'।

সেদিন ও পর্যন্তই। শূটিং চলছে পরের দিন সেই একই জায়গায় । এক অবসরে জহির তার অভ্যাস মাফিক শূটিং স্পট থেকে একটু তফাতে হৈ-হট্টগোলের বাইরে নির্জনে গিয়ে বসে। সেদিনও আমি অনেক কৌতুহল নিয়ে চুপি চুপি তার কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনি মশাই লোকটা সুবিধার না, সবাই এক জায়গায় আর আপনি একলা-একাকী!' জহিরের নির্জনতা প্রিয় আচরণ লক্ষ্য করে ওই দু'দিন যেভাবে কথা বলেছিলাম, তা ছিল মানুষটির প্রতি আমার স্বাভাবিক কৌতুহলের বহিঃপ্রকাশ। কোনো দুবর্লতা থেকে নয়। কিন্তু আমার ওই জিজ্ঞাসাই কি জহিরের মনে আমার প্রতি কোনো রকম হৃদ্যিক দুর্বলতার ভ্রুনের জন্ম দিয়েছিল সে প্রশ্ন আমার মনে প্রায়ই উদয় হতো জহিরের সাথে বিয়ে হওয়ার পর। আরেকদিন, ওই একই স্পটে শূটিং

জোনের বাইরে আশ্রয় প্রার্থী জহিরকে বলেছিলাম, 'শট ডিভিশন থেকে শুরু করে সবকিছুই তো আপনি করেন, পুরোপুরি পরিচালক হিসেবে জহির যখন 'কখনো আসেনি' করবার সিদ্ধান্ত নেয়, আমি তার ছোট্ট একটা উপকার করে দিয়েছিলাম। ১২

সুমিতা দেবী তাঁর লেখায় আরও উল্লেখ করেন যে ঃ

'১৯৬০ সালের শেষের দিকের কথা। তখন নির্মতাকে এফডিসির কাছে ২৫ হাজার টাকা জমা দেয়ার নিয়ম ছিল। জহির যখন 'কখনো আসেনি' করতে যাবে, তার ওই ২৫ হাজার টাকা লাগেনি। তারও মূলে নাজির আহমদ। আর তিনি সেটা করেছিলেন আমারই অনুরোধে। এরপর জহির কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই হোক, আর অভিনেত্রী হিসিবে আমার সামান্য গুণপনার জন্যই হোক-নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। নাজির আহমদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরাবরই কুয়াশার মতো অস্পষ্ট ছিল, কখনো তা মোড় নিতে-নিতেও নিতে পারিনি। আমার জন্যেই হোক, বা তাঁর জন্যেই হোক। হয়ত এমনও হতে পারে তাঁর প্রতি আমার অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবোধ একটা দেয়াল খাড়া করে দিয়েছিল। একদিকে জহির, একদিকে নাজির আহমেদ, আরেকদিকে সেই নায়ক-গায়ক সুরকার। তিনজনের সঙ্গে সম্পর্কে স্পষ্ট, অস্পষ্ট আকর্ষণে আমি ঘুরপাক খেতে লাগলাম। এই অবস্থায় জহির আমাকে নাড়া দিল। ভয়ানকভাবে। মনে হলো ও আমাকে আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে ফেলল। টেনে নামালো। জহির তখন ঘন-ঘন আমার বাসায় যাওয়া-আসা শুরু করেছে'। ১৩

সুমিতা দেবীর আরও লিখেছেন ঃ

'এ দেশ তোমার আমার' থেকে জহিরের সঙ্গে আমার জানাজানি শুরু। 'কখনো আসেনি'র সময় কাছাকাছি আসা, আর একটু দুরে সরে যাওয়ার পারস্পরিক দ্বিধা-দ্বন্ধ। কিন্তু একদিন তার অবসান ঘটল। মিঠুসহ লুৎফর রহমানের বাসা থেকে ফেরার পথে জহির একদিন আমাকে নিয়ে ঘুরতে বেরোয়। রিকশায় করে। তখন ষ্টেডিয়াম নতুন হচ্ছে। এ কথা সে কথার পর ও আমাকে সরাসরি প্রস্তাব করে বসে, 'আমি আপনাকে বিয়ে' করতে চাই। তিন দিন সময় দিলাম। গভীরভাবে ভেবে, জবাব দিবেন। ব্যস, সেদিন ওই পর্যন্তই। জহির চলে গিয়েছিল। আমি বাসায় আসি। মাঝখানে ছবির কাজের ব্যস্ততায় কি বলেছিল, সে কথা ভুলে যাই, যদিও এ তিনদিনই জহিরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু জহির ছাড়বার পাত্র নয়। তিন দিনের মাথায় আবার জিজ্ঞেস করে?

ঃএকটা কথা বলেছিলাম?

ঃকি কথা ?

ঃআবার মনে করিয়ে দিলে ভাল হয়।

ঃ বিয়ে করতে চাই।

আমি প্রবল দ্বিধাদ্বন্ধে জড়িয়ে পড়ি। আবার অনেকদিন জহিরকে বোঝাই। বোঝে না। বলি আমার আগের বিয়ের কথা। বলি, মেয়েদের বিয়ে একবারই হয়। আমার মার দোহাই দেই। বলি অতুলের ঔরসজাত সন্তার মিঠুর কথা। জহির সব শোনে। শুনে বলে, আমি দায়িত্ব নেব মিঠুর। ১৪

সুমিতা দেবী তাঁর লেখাতে আরো উল্লেখ করেন যে, জহিরের সাথে এসব কথা বলার পরও জহির যেন তাঁর বাসায় আসা যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যায়। সুমিতা লিখেছেন ঃ

'জহির এ সময় ঘন ঘন আমার বাসায় আসত। মিঠুকে আদর দেয়ার ফলে ছোট্ট মিঠু তাকে বাবা ডাকতে শুরু করে। জহির রায়হানের প্রস্তাবের কথা কাউকে বলি না। কারো কাছে পরামর্শ নেই না। অবশেষে অনেক দ্বিধাদ্বন্ধ কাটিয়ে রাজী হয়ে যাই। জহিরকে আমি বিয়ে করব-মনে মনে সম্মত হই। জহিরকে আমার সম্মতির কথা জানাই। তবে একটি শর্ত ছিল যে, আমাদের বিয়ের খবর গোপন রাখতে হবে। জানবে আমাদের একান্ত গুটিকয় আপনজন এ ছাড়া কেউ নয়। ১৯৬০ সালে আমার আর জহিরের বিয়ে হয়।১৫ গোপনে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ে পড়ানো হয়েছিল মগবাজার কাজী অফিসে। আমার সঙ্গে

গিয়েছিলেন বর্তমানে পাকিস্তান প্রবাসী পরিচালক নজরুল ইসলাম। জহিরের সঙ্গে এসেছিলেন চিত্র-সম্পাদক এনামুল হক। এ দুজনই আমার আর জহিরের বিয়ের সাক্ষী। মাকে এসে বলি বিয়ের কথা। মা ভীষন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেদিন। আমার আর জহিরের বিয়ের খবর ফাঁস হয়েছিল ১৯৬২ সালের দিকে।১৬

জহির রায়হানের সংগে বিয়ের পূর্বেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিলুফার বেগম নাম ধারণ করেন। জহির রায়হানের সঙ্গে বিয়ের ফলে চিত্র জগতে দুজনের জীবন এক হয়ে যায়, সৃজনশীলতা ও পারস্পরিক সহধর্মীতা ও সহমর্মিতায় হয়ে ওঠে তা ভরপুর। জহির রায়হান পরিচালিত কয়েকটি ছবিতে তিনি নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন। জহির রায়হানের প্রেরণা ও সহায়তায় সুমিতা দেবীর মালিকানায় 'মিতা' ফিল্মস নামে একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ১৯৬৫ সালের ০৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়, এ সময় পাকিস্তান ভারতীয় ছবির আমদানী ও প্রদর্শনী নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এর ফলে ঢাকার ছবির বাজারে কিছুটা আশার সঞ্চার হলেও পুরো সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ। সেপ্টম্বর ও অক্টোবরে জহির রায়হানের পারিবারিক জীবনে ঝড় ওঠে। তিনি স্ত্রী সুমিতার সঙ্গে বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য আদালতে আবেদন করেন। এদিকে জহিরের সংগে এক চিত্র নায়িকার (সুচন্দা) গোপন বিয়ের খবর পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।১৭ সংসার জীবনের এ টানা পোড়ন যা রটে তা বটে সত্যতায় পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে সুমিতা-জহির এর দাম্পত্য জীবন কাঁচের দেয়ালের মতো ভেঙ্গে যায়। তবে কাঁচ ভাঙ্গার পরও যেমন এর অস্তিত্ব থাকে তেমনি তাদের দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ ঘটলেও সুমিতা নিয়ে যান জহির রায়হানের অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব হচ্ছে এ দম্পত্তির দুই সন্তান, বিপুল রায়হান (চিত্র পরিচালক ও টিভি অনুষ্ঠান নির্মাতা এবং অনল রায়হান (সাংবাদিক)। সুমিতা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ দুই সন্তানের সংগেই ছিলেন।

কর্ম-জীবন

সুমিতার কর্মজীবনে জড়িত হওয়ার বিষয়টি বেশ রোমাঞ্চকর ও ঘটনাবহুল। তাঁর কর্মজীবনের প্রায় পুরোটা জুড়েই রয়েছে অভিনয়-বিশেষ করে চলচ্চিত্র জগতের সংগে। তিনি অবশ্য পরে চলচ্চিত্র প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত হন। চিত্রজগত ছাড়াও তিনি জড়িত হয়েছিলেন বেতার, মঞ্চ ও টেলিভিশনের সঙ্গে একজন অভিনেত্রী হিসেবে। তিনি রাজনীতি ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠ পোষকতায় অনেক চিত্র কর্মীর জন্ম হয়েছে। তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ।

ক). অভিনয় ঃ চলচ্চিত্র

সুমিতা একজন রাজনৈতিক কর্মী ও শখের ফটোগ্রাফার এর সাধারণ স্ত্রী থেকে চিত্র জগতে নায়িকা হয়ে আসেন সেই ১৯৫০ দশকের মধ্যভাগে। বিয়ে এবং সন্তানের মা হওয়ার পর তিনি চিত্র জগতে জড়িত হয়ে অভিনয় শিল্পে এদেশের নারীদের মধ্যে অন্যতম অগ্রগামী শিল্পী হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। রক্ষনশীল সমাজের মেয়ে হয়েও তিনি পারিবারিক ও সামাজিক বৃত্তের বাইরে এসে জড়িত হয়েছিলেন চিত্রজগতে সরাসরি নায়িকা হিসেবে, আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা'(ইপিএফডিসি)য় নির্মিত প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনী চিত্র আসিয়ার মাধ্যমে। যেহেতু, তিনি চিত্রশিল্পের ভিত্তিভূমি ও সূতিকাঘার এফডিসি'র প্রথম ছবি 'আসিয়া'র মাধ্যমে নায়িকা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে পরবর্তীতে আরও কয়েকটি চলচ্চিত্রে নায়িকা হিসেবে অভিনয় করে খ্যাতি ও দ্যুতিতে উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর রাখেন সেজন্য তাঁকে ঢাকা তথা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের 'ফার্ষ্ট লেডী' বলা হয়ে থাকে। তাঁর পথ ধরে পরবর্তীকালে ঢাকার চিত্র জগতে নায়িকা হয়ে আসেন রওশন আরা, সুলতানা জামান, শবনম, রোজী, কবরী, সুচন্দা, শর্মিলী, আনোয়ারা, শাবানা প্রমুখ।

যেভাবে নায়িকা হলেন :

একজন সাধারণ গৃহবধূ থেকে চিত্রজগতে তাঁর জড়িত হওয়ার ব্যাপারে প্রথম স্বামী অতুল লাহিড়ীর বিশেষ ভূমিকা আছে বলে সুমিতা তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

'অতুল দিনরাত্রির প্রায় সময়টাতেই তার রাজনৈতিক কর্ম-কান্ড অথবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত থাকত। যেদিন অবসর পেত, আমার ছবি তুলত। ছবির পর ছবি। বিভিন্ন ভঙ্গিতে। বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে। আর বলত, 'ছবির নায়িকাদের মতো তোমার চেহারা।' আমি পুলকিত হতাম। নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন কি দেখতাম তখন? না, তখনো নয়। আরো পরে।'

অতুল আমাকে ভালবাসত। কিন্তু সেটা ছিল চাপা। রাজনৈতিক ক্রিয়াকান্ড আর পেশার পেছনে তার অধিকাংশ সময় চলে যেত। আহার গ্রহনেরও নির্দিষ্ট কোন সময় ছিল না। রাতে ফিরত। ক্লান্ত, অবসন্ন। টুকটাক কথা। তারপর ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়ত। আমি দুষ্টুমি করে তার নাকে মাঝে মাঝে সুড়সুড়ি দিতাম। সে জেগে উঠত। আমরা দুজন মিলে তখন হাসতাম প্রাণখুলে। কথা বলতাম।

ছবির নায়িকা হব, এ স্বপ্ন আমার ছিল না। এ স্বপ্ন আমার মধ্যে জাগিয়ে তোলে অতুলই। হঠাৎ করে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানে জারি করা হয় ৯২ (ক) ধারা। রুদ্ধ করা হয় তখনকার সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকান্ড, হরণ করা হয় গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মিদের। অতুলও এ সময় গ্রেফতার বরণ করে। এ অবস্থায় আমি আবার কোলকাতায় চলে যাই। সেখানে লোক মারফৎ যোগাযোগ হয় পরিচালক চিত্তবসুর সংগে। তিনি 'রানী বউ' নামে ছবি করবেন। আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। কথা হয়। কিন্তু কাকীমা আমার ছবির নায়িকা হওয়ার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় প্রবল বাদ সাধলেন। বলেন, 'অতুলের অনুপস্থিতিতে তুই এসব করছিস!আমি ওর কাছে মুখ দেখাব কি করে? অতুলের মুক্তির পাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখিনা । কোন যোগাযোগও নেই । হঠাৎ একদিন অতুল মুক্তি পায়। আমি দেশে ফিরে আসি। আমার তখন কোলকাতার ছবির জগতের ওপর একটা মায়া জমে গিয়েছিল। অতুল আমার মনোভাব বুঝতে পেরে বলে, 'দেশে চল। ওখানেই সব হবে।'

আমি আবার কোলকাতা থেকে দেশে ফিরে আসি। এ সময়ই তখনকার একটি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোয় ('৫৬ সালের দিকে) গোপাল দে সুন্দরম নামে এক ভদ্রলোক ছবি করার উদযোগ নিয়েছেন। ছবির নাম 'পানির সুন্দরী'। অতুল বিজ্ঞাপনটা দেখে আমাকে ব্যাপারটা জানায়। আমার একটু খুশি হওয়ার কারণ ঘটে।

অতুল তাঁর রাজনৈতিক সতীর্থদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে এবং তার ষ্টুডিওর মাল-মশালা সংগ্রহের জন্যে প্রায়ই ঢাকা যেত। সেখানেই কেমন-কেমন করে তার সঙ্গে যোগাযোগ হয় ছবির লাইনের লোকজনের। তারপর ঢাকা থেকে ফিরে এসেই আমাকে সে সরাসরি প্রস্তাব দেয়'তোমাকে নায়িকা হতে হবে?'
'তার মানে?'
'ছবির, মানে সিনেমার নায়িকা।'

আমি আকাশ থেকে পড়ি। আপত্তি করি। বলি, ' ও লাইন কি ভাল?' 'নিজে ভাল থাকলে, সবই ভাল। এভাবেই বোধ হয় সেদিন কথাগুলো হয়েছিল। আমার ঘোর আপত্তি অতুলের দৃঢ়তার কাছে টেকেনি। টিকতে পারিনি। আমি একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ি। ধীরে ধীরে ছবির নায়িকা হওয়ার স্বপ্ন আমার মনেও শেকড় বিস্তার করতে থাকে। কিন্তু গোপাল দে সুন্দরমের বিজ্ঞাপিত ছবিটি করা হয় না। তিনিও পরিচালক হতে পারেননি আর কোন দিন।'[১৮]

'আসিয়া' চলচ্চিত্রের নায়িকা হওয়ার পটভূমি সম্পর্কে লিখেছেন সুমিতা দেবী ঃ

'ঢাকায় আসি আবার। পিসীমার আশ্রয়ে থাকতে থাকি। ঢাকার সুত্রাপুর এলাকায়। সঙ্গে বোন অণিমা ভট্টাচার্য। পরিবারের আরোক'জন সদস্য। যোগাযোগ হয় ফিল্ম লাইনের লোকজনের সঙ্গে। অতুলের বন্ধু তারা। অতুল এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েই ফিরে যায় মাদারীপুরে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে, তাঁর ব্যবসায়িক কাজে। ঢাকায় এসে যোগাযোগ হয় শহীদুল আমীনের সঙ্গে। তিনি ছবি করবেন। তার রিহার্সেল চলছে। আমিও রিহার্সেল করি। আর স্বপ্ন দেখি ছবির নায়িকা হব একদিন।

১৯৫৭ সালের কথা এফডিসি তখনও পর্ণাঙ্গ হয়নি। এখণকার এফডিসি'র সঙ্গে তখনকার এফডিসি'র আকাশ পাতাল ব্যবধান। এফডিসি'র চত্ত্বরে তখন রাতে তো বটেই, দিনের বেলায়ই শেয়াল ডাকত। আগাছা জঙ্গলে পরিপর্ণ ছিল। এর এক বছর আগেই 'মুখ ও মুখোশ' মুক্তি পেয়েছে। আর 'মুখ ও মুখোশ'-এর মুক্তিই প্রমাণ করেছিল, এ দেশের মাটিতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকলে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব।

'আকাশ আর মাটি' আর 'আসিয়া' নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে তখন। সেই তখন, আজ থেকে বহু বছর আগে । লেবরেটরি ছিল বিজি প্রেস ভবনে। প্রজেকশন রুমও বানিয়েও শ্যুটিং হতো। এমন দিন গেছে। আর এ অবস্থার একদিন, দিনক্ষণবা তারিখ মনে নেই, হাজির হলাম বিজি প্রেসে। অতুলের এক বন্ধু কচি বাবুর সঙ্গে। দুরু দুরু বুকে। আমার স্ক্রিন টেষ্ট নেয়া হবে।

যদ্দুর মনে পড়ে আমার প্রথম দিনের স্ক্রিন টেষ্টে উপস্থিত ছিলেন কলিম শরাফী (প্রখ্যাত রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পী এবং জহির রায়হানের সঙ্গে যুগ্মভাবে 'সোনার কাজলে'র পরিচালক), বেবী ইসলাম (চিত্রগ্রাহক পরিচালক), শব্দগ্রাহক মোহসীন (বর্তমানে পরিচালক), ক্যামেরা ম্যান আজাদ খান, আবদুল আহাদ (সংগীত পরিচালক), নুরুল ইসলাম ('আসিয়া'র প্রোডাকশন কন্ট্রোলার), চিশতী সাহেব এবং অপটিক্যাল বিভাগের লুৎফর রহমান। আর সর্বোপরি ছিলেন এফডিসির তখনকার অপারিটিভ ডিরেক্টর নাজির আহমদ।

ভেতরে ভেতরে আমি দুর্বল বোধ করতে থাকি। এতগুলো লোকের সামনে আমাকে কিভাবে কি করতে হবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কিংকর্তব্যবিমুঢ়-আমার মনের তখনকার অবস্থাকে বোধহয় ওই একটি শব্দে প্রকাশ করা চলে। সবাই তখন আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। এতগুলো চোখের সামনে নিজেকে আমি বড় অসহায় বোধ করতে লাগলাম। কার কি মতি গতি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। টুকটাক মন্তব্য শুরু পরোক্ষে। বেবী ইসলাম বললেন, 'এই ঝড়ো কাককে কোথা থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে?' আর এ মন্তব্য শুনেই আমার মনে দ্রুত সন্দেহ জাগে, আমি নায়িকা হওয়ার যোগ্য নই। এরা আমাকে বাদ দেবেন। নেবেন না। না হলে এত গড়িমসি আর তাচ্ছিল্যমলক মন্তব্য কেন? কেউ আমাকে একটু বসতেও বলছে না। কলিম ভাই বললেন, 'আপনি একটু বসুন। এই বেবী, তুমি একটু চুপ করতো'। আমি বসলাম।

প্রথম দিনের স্ক্রিন টেষ্টে, এত যে অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হবে ভাবতেই পারিনি। অথচ এখানে আসার আগে নিজেকে প্রস্তুত করতে আমার কি প্রচন্ড আগ্রহই না ছিল। আমি বরাবর ঢাকেশ্বরী ২ নম্বর মিলের সবুজ রঙের 'প্রতিমা' শাড়ি পরতাম বেশির ভাগ সময়। সেদিন বাসা থেকে বেরিয়ে বিজি প্রেসে যাওয়ার পথে নারিন্দায় চিনু নামে এক বান্ধবীর বাসায় যাই। ওর বাসায় গিয়ে আবার শাড়ি বদলাই। জবরদস্তি করে চিনুই পরিয়ে দেয় 'অনন্যা' শাড়ি। নায়িকা কাননবালা এই শাড়িই পরতেন ছবিতে অভিনয় করার সময়। আর সেই আমি স্ক্রিন টেষ্টে দিতে এসে এতগুলো লোকের সামনে প্রায় অপদস্তই হতে লাগলাম বলা যায়। কচিদা আমাকে বিজি প্রেসে পৌঁছে দিয়েই চলে গেলেন কোথায়। আমি কি করি একলা একলা। হঠাৎ বেবী ইসলাম আমাকে বললেন, মেকআপের কোন জিনিসপত্র সঙ্গে এনেছেন?'
আমি বললাম 'না। তবে, সঙ্গে রুমাল আছে।'

বেবী ভাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি বললেন, 'ছি-ছি-ছি! একটু আগে একটা মেয়েকে দেখেছেন? (আমি যখন বিজি প্রেসের দোতলায় উঠতে সিঁড়ি ভাঙছি, তখন সেই মেয়েটিকে ম্লান মুখে নেমে যেতে দেখেছি।) নাজির সাহেব তাকে বাদ দিয়েছেন। স্ক্রিন টেস্টও নেননি। এক নজর দেখেই বিদায় করে দিয়েছেন।'

বেবী ভাইয়ের কথা শুনে মনে মনে খুব দমে গেলাম। আর দেখতে ইচ্ছে করছিল নাজির সাহেব নামের সেই লোকটিকে, যিনি এত ক্ষমতা ধরেন। আমি তাঁকে অন্তত এক পলকের জন্য দেখতে চাই-স্ক্রিন টেস্টে পাশ করি বা না করি।

ঠিক এ সময়, আমার মানসিক ভাবনার ঠিক এ পর্যায়ে, নাজির সাহেব প্রবেশ করলেন। সবাই উঠে দাঁড়ালেন। আমিও। দেখলাম নাজির আহমেদকে। পরনে বাদামী রঙের প্যান্ট, গায়ে শাদা জামা। পুরুষোচিত, একই সঙ্গে নায়কোচিত চেহারার মানুষ। হাতে তিনটি আংটি। ঝকমক করছে। চুল পরিপাটি করে আচড়ানো। তিনি ঘরে ঢুকেই বেবী ইসলামকে বললেন, 'ভিউ ফাইন্ডারটা একটু দেখি?' বেবী ভাই ভিউ ফাইন্ডারটা নাজির সাহেবকে দিলেন। তিনি ওটা হাতে নিয়েই আমাকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'এই যে মহিলা, আমার কাছে একটু আসুন তো।' আমি মন্মুগ্ধের মতো তাঁর আদেশ পালন করলাম। 'দাঁড়ান এখানে'। আদেশ করলেন তিনি।আমি ঘরের এক কোণে দাঁড়ালাম। নাজির সাহেব বললেন, 'আমি যেভাবে যেভাবে নির্দেশ দেব, আপনি ঠিক সেভাবে তা পালন করে যাবেন।' আমি তাঁর নির্দেশ মতো মুখ-চোখের ভঙ্গি করলাম। ঘাড় ফেরালাম। নিচ থেকে ওপরে। আবার ওপর থেকে নিচ। নাজির সাহেবের চোখে আঠার মতো সেটে আছে ভিউ ফাইণ্ডার।

ভিউ ফাইণ্ডারে আমাকে নিরীক্ষণ করা শেষে নাজি সাহেব কলিম ভাইকে বললেন, 'কলিম তুমি সংলাপ উচ্চারন করতে ওকে একটু সাহায্য কর!' প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে নাজির সাহেবের কথা মতো কলিম ভাই আমাকে স্ক্রিপ্ট থেকে একটা মোটামুটি লম্বা সংলাপ উচ্চারণ করতে বললেন। আমি কলিম ভাইয়ের প্রম্পট অনুসরণ করে সংলাপ উচ্চারণ করলাম। আমার উচ্চারণে যেখানে যেখানে অসুবিধা হচ্ছিল, কলিম ভাই, সে জায়গাগুলো ঠিকঠাক মতো উচ্চারণে সাহায্য করলেন। সংলাপ বলতে একটু অসুবিধাই হচ্ছিল। কারণ ঠান্ডা লেগে গলা একটু বসে গিয়েছিল। নাজির সাহেব বললেন 'তিন চার দিন পরে আবার দেখা করবেন।'......

তারপর নরুল ইসলমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এখানে আসা যাওয়ার ব্যাপারে এখন থেকে উনিই আপনাকে সাহায্য করবেন। আর নরুল ইসলামকে বললেন, 'কোন ফার্মেসী থেকে উনাকে (আমাকে) সর্দি দর করার ওষুধ কিনে দেবেন।'

একটা বেবী টেক্সি করে আমি আর নরুল ইসলাম বাসায় ফিরছি। পথে এক জায়গায় টেক্সি থামিয়ে তিনি আমার জন্যে ওষুধ কিনে আনলেন।

কিন্তু বাসায় ফিরে স্বস্তি পাই না। ভাল করে নাওয়া খাওয়া হয়না। মনে প্রবল তোলপাড়, তবে কি বাদ পড়লাম? ছবিতে অভিনয় করা হবে না? ওরা কি আমাকে চিরদিনের জন্যে বাদ দিয়ে দিলেন? আবার পাল্টা ভাবনা। না, একেবারে বাদ দিলে বা ওঁরা কি আমার মধ্যে কোন সম্ভাবনা না দেখলে, তিন চারদিন পর আবার দেখা করতে বললেন কেন? ভেবে ভেবে ভাবনার দোলায় দুলতে দুলতে শেষে একটু স্বস্তি পেলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম মনে মনেঃ আমাকে পারতেই হবে। পরীক্ষায় আমাকে পাস করতেই হবে।

তিন চারদিন পর নরুল ইসলাম আমাকে আবার বিজি প্রেসে নিয়ে গেলেন। সেদিনও সবাই উপস্থিত। নাজির আহমদ, কলিম শরাফী, মোহসীন, চিশতী সাহেব, বেী ইসলাম। আজ সবাই আমাকে বসতে বললেন। ঘরে ঢুকতেই নাজির সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ আপনার নাম?

ঃ হেনা লাহিড়ী।

ঃ বাড়ি?

ঃ মাদারীপুর।

ঃ চোর চোট্টা খেজুর গুড় সব পাওয়া যায় মাদারীপুর। হাসতে হাসতে কৌতুক করে নাজির সাহেব ছড়াটা কাটলেন। সেদিন ওই পরিবেশে দুরু দুরু বুকেও ছড়াটা শুনে বেশ মজা পেয়েছিলাম। হেসেও উঠেছিলাম।

তারপর সেই শুভ লগ্নটি এল। আমার স্ক্রিন টেষ্ট নেয়া হলো। লাইট জ্বলল। ক্যামেরা চলল। নাজির সাহেবের নির্দেশ মতো মুখ চোখ নাড়লাম। তারপর সংলাপ আউড়ালাম নাজির সাহেবের সঙ্গে। 'আসিয়া'র নায়কের সংলাপ উচ্চারণ করলেন তিনি। আর আমি নায়িকার। কিন্তু সেদিন ওই পর্যন্তই।মনের ভেতর ধুপুকি। শেষ পর্যন্ত টিকবতো?

আবার দু'তিন দিন পর গেলাম বিজি প্রেসে। ডাক পড়ল নাজির সাহেবের। প্রজেকশান রুমে সবাই উপস্থিত। আলো নিভল। পর্দায় ভেসে উঠল আমার ছবি। নিজের ছবি রূপালী পর্দায় দেখে, সেদিন আমার অনুভূতিটা কেমন হয়েছিল প্রকাশ করতে পারব না। আনন্দের একটা অবরুদ্ধ অনুভূতি বুকের ভেতরে তোলপাড় শুরু করেছিল। চোখে কোণে জমেছিল দু'ফোট অশ্রু। আঁচলের খুট দিয়ে চোখ মুছেছিলাম, অন্ধকারে, সবার অজান্তে।

*স্ক্রিন টেষ্টে পাশ করলাম। এরপর আমার কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হলো টেপ রেকর্ডারে। নাজির সাহেব ডেকে পাঠালেন তাঁর অফিস রুমে। বললেন, 'আপনি আমাদের ছবির নায়িকা নির্বাচিত হলেন।' কথা বলেই হাতে তুলে দিলেন এক হাজার টাকার একটা চেক। 'মাসে ৫০০ টাকা করে পাবে। পরে এই টাকা অ্যাডজাষ্ট করে নেয়া হবে।' আমার মনের অবস্থা তখন কেমন হয়েছিল, আজ আর তা ভাষায় বা মুখের কথায় প্রকাশ করতে পারব না। যাই হোক, আমি নায়িকা হলাম, 'আসিয়া'য়।*১৯

এদিকে 'আসিয়া'র পরিচালক ফতেহ লোহানীর সূত্রে জানা যায় সুমিতার নায়িকা হওয়ার কথা। ফতেহ লোহানী লিখেছেন ঃ

'১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি। 'আসিয়া'র কাগজপত্রের কাজ শেষ করে ফেলেছি। একদিন একটি মেয়ে এলেন আমার বাসায় দেখা করতে। ছিপছিপে গড়ন। শ্যামলা রঙী। অমায়িক হাসি ছড়িয়ে অভিবাদন জানালেন।
বসতে বললাম।

উনি বসলেন। কিন্তু কথা শুরু করবেন কি দিয়ে হয়তো তা ঠিক করতে না পেরে বড় বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিছুটা যেন অসহায়ের মতো। আমি সে দিনের সেই দুটি স্বচ্ছ চোখে খুঁজে পেলাম 'আসিয়া'কে।
নাম শুধালামঃ

*বললেন, হেনা, হেনা লাহিড়ী। আমি বললাম, উহ আজ থেকে আপনি সুমিতা। ছবির সত্যিকার প্রাণ সঞ্চার করেন যাঁরা তাঁরা হচ্ছেন ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রী। সেদিনকার সেই অনাড়ম্বর মেয়ে সুমিতার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা লুকিয়ে ছিল। আমি ওকে শুধু সাহায্য করেছি মাত্র। এই অচেনা শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে সুমিতার পরিচয় করিয়ে দিতে, দেখিয়ে দিয়েছি মাত্র কোন পথে এগিয়ে যেতে হবে। সুমিতা তার সমগ্র অনুভতি দিয়ে চরিত্রকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, রূপায়িত করেছেন। এতে ওর কোনো ক্লান্তি ছিল না, বিরাম ছিল না। শিল্পীর জন্য আত্মসমীক্ষা আর অক্লান্ত অনুশীলন হচ্ছে একমাত্র পাথেয়। এই উপাদান যাদের নেই, তারা কোনদিনই শিল্পী হতে পারবেন না। এই সঙ্গে আর একজনের কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পর্ণ থেকে যাবে। তিনি হচ্ছেন কাজী আবদুল খালেক। কাজী খালেক একজন নির্ভরশীল অভিনেতা। চরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্বের গভীরে তাঁর সন্ধানী মন অনায়াসে নামতে পারে। তারপর অতি অনায়াসে তিনি চরিত্রের সম্পর্ণ ব্যক্তিত্ব আরোপ করে চলেন। এখানকার ছবিতে যথাযথভাবে এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিল্পীর প্রয়োগ এখনও করা হয়নি'।*২০

চিত্র নায়িকা হিসেবে ফতেহ লোহানীর পরিচালনায় 'আসিয়া' ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন সুমিতা লাহিড়ী। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর এই ছবিটির কাজই প্রথম শুরু হয়। কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রের নামানুসারেই এ ছবিটির নামকরণ করা হয়। 'আসিয়া' নির্মাণের পটভূমি সম্পর্কে এফডিসির নির্বাহী পরিচালক ও এ ছবির কাহিনীকার সংলাপকার নাজীর আহমদ জানিয়েছেন যে ঃ

'ষ্টুডিও ফ্লোর নির্মাণের পর আমরা প্রথম শুরু করি 'আসিয়া' নামে একটি ছবির কাজ। গ্রামীণ জীবন ভিত্তিক 'আসিয়া' নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতের জন্য একটি টেক্সট ও ট্রেনিং ছবি করা। 'আসিয়া'র পরিচালক ছিলেন ফতেহ লোহানী। কাহিনী ও সংলাপ আমার । ছবির নায়িকা হেনাকে (সুমিতা) যোগার করা হয় ফরিদপুর থেকে। চেহারা দেখে তার মুখে উচ্চারিত গ্রামীণ ভাষার উচ্চারণ শুনে তাঁকে নায়িকা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।'২১

আসিয়া (১৯৫৭-৬০)

সুন্দর রেখার মতো স্পষ্ট আর সরল পর্ব বাংলার গ্রামীণ মানুষ। পল্লীর মাটির ঘরে তাদের জন্ম, প্রকৃতির মুক্ত উদার কোলে তাদের শৈশব, সবুজ মাঠ আর প্রান্তরে নিসর্গের ছবি নিয়ে জীবন্ত তাদের যৌবন। দেশের মাটির নরম বুকে যে জীবনের মল সেই সরল দিগন্তের রূপময় কাহিনী হচ্ছে 'আসিয়া'।

পল্লীগাথার সুন্দর কাব্যময় রূপের সৌকর্য্যে মুখর, গীতিকাব্যের মতো ছন্দের ব্যঞ্জনায় মধুর দু'টি শিশু আসিয়া(রুবী) আর মসু মিয়া (সেলিম)। দরিদ্র পিতা মনিরুদ্দি(ভবেশ) আর ব্যাধিগ্রস্থ মাতার (সিতারা) নয়নের মণি আসিয়া। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন ডানপিটে ছেলে মসু। চাচা সিকদার সাহেব (কাজী খালেক) মাঝ বয়েসেও বিয়ে করেন নি। তাঁরই অকপট স্নেহে মসু মিয়া মানুষ।

শৈশবের স্নিগ্ধতায় 'আসি' আর 'মসু' হলো একে অন্যের খেলার সাথী, অভিন্ন-হৃদয় দরদী বন্ধু। যৌবনের উত্তর বসন্তের সঙ্গসুখে তারা হ'লো কাছাকাছি, একে অপরের প্রিয়তর। চাঁদনী রাতে গানের কাকলিতে জানাতো তারা তাদের মনের কথা। ছায়াবিথীর স্বর্পিল আলো ছায়ায় দোয়েলের শিষের সাথে কোয়েলের কুহুতানে ছড়ায় ছড়ায় আসিয়া (সুমিতা) আর মসু মিয়া (শহীদ) জানালো হৃদয় উজার করা গভীর ভালবাসা। ভবিষ্যতের নিষ্ঠায় তারা একে অন্যের কাছে চাইলো মুক্তির বন্ধন। পরম আনন্দে স্নিগ্ধ ধারায় তারা উজ্জ্বল করতো চাইলো তাদের জীবনকে।

মসুর চাচা সিকদার সাহেবের ডান হাত হচ্ছে সরকার তাজুদ্দি(রণেন কুশারী)। বৈষয়িক বুদ্ধি তার প্রবল। তারও ঘরে এক সোমত্ত বয়েসের মেয়ে হীরামন (ছবি) বিবাহযোগ্য । তাজুদ্দি চায় কৌশলে যদি হীরামন আর মসুমিয়ার হাত মিলিয়ে দিতে পারে তাহলেই তার অব্যর্থ অভিপ্রায় সার্থক হয়। সুতরাং মসু আর আসির মেলামেশা তার চোখে ভাল ঠেকে না।
একদিন হঠাৎ সরকার জানলো যে, সিকদার সাহেব বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন। তাজুদ্দি এই সুযোগের প্রতীক্ষায়ই ছিলেন। রাজী করালেন আসিয়ার বাবা মনিরুদ্দিকে আসিয়ার বিয়ে পৌঢ় সিকদার সাহেবের সঙ্গে দিতে।

আসিয়ার মাতা এতে আপত্তি করলেন। আসিয়া ও মসু দু'জনেই জানলো এ বিয়ের কথা। কিন্তু গ্রামীণ জীবনের সরল রীতিনীতি অনুযায়ী কেউ এ ধরণের ঘোরতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে রুখে দাঁড়াতে পারলো না। মসু আর আসির প্রণয়ের কথা গোপন রেখে দিল তাজুদ্দি সিকদারের কাছ থেকে।

যথাসময়ে সিকদার সাহেবের সংসারে বধুরূপে এসে হাজির হলো আসি। আসিয়ার সঙ্গে মসুর নোতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন সিকদার সাহেব-"চাচিই ক'ও আর মা-ই-ক তুমি অইলা মসু মিয়ার সব।" ভাগ্যচক্রের নির্মম অনুসাশনে দু'টি প্রণয়-মুগ্ধ হৃদয়ের হলো চরম পরাজয়। প্রণয়ের রঙধনু দুটি যুবক-যুবতীর জীবনে একদিন হঠাৎ যেমন নানা রঙের দিনগুলি সাজিয়ে দিয়েছিল মাধুরীর বর্ণচ্ছটায়, তেমনি অকস্মাৎ তা মিলিয়ে গেল অমানিশার ঘোর অন্ধকারে। গ্রামের আর একটি চিরন্তনী চরিত্র পাগলী ভৈরবী (শিরীন) জানতো এ - দুটি হৃদয়ের প্রেমঘণ তপস্যার কথা। পাগলী জানে জীবনটা আমাদের হাওলাতী-আসিয়ার যে তপস্যা শুধু মসুর উদয়-দিগন্তের সন্ধান চেয়েছে-তার পাদপীঠ জীবনের দেবতা কোথায় রেখেছেন তা কে জানে? ভাঙ্গা ধানের টুকরোর মতো তাই ভৈরবী পাগলী শুধু হেসেই খান্ খান্ হ'তে লাগল।

জোর ক'রে মাতৃত্বের জটিল দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হলো আসিয়ার ওপর। অনুরাগের দারুন দহন জ্বালায় পুড়ে পুড়ে ছাই হতে লাগলো আসিয়ার অন্তর । এও কী সম্ভব, একই বাড়ীতে, এই সংসারে প্রণয়ীয় সঙ্গে মা ও ছেলের সম্পর্ক গড়ে তোলার কঠিন প্রচেস্টা? মসুর জীবনে ছন্নছাড়া আত্মত্যাগের অভীপ্সা জাগলো। আসি হলো আরো উতলা। এ অসহ্য পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য একদিন আসিয়ার অনুরোধে মসু মিয়া রাজী হলো বিয়ে করতে। আসি নিজে গেল মসুর জন্য মেয়ে দেখতে। শেষ হলো মেয়ে দেখা। কিন্তু শুরু হলো আসিয়ার জীবনের আত্মহুতি বিসর্জ্জনের পালা। কৈশোরের সব অঙ্গীকারের

স্বপ্ন -প্রাসাদ কে যেন ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিলো। জীবনের সমুখে এগিয়ে এলো এক চরম পট পরিবর্তন। এই পট পরিবর্তনেই "আসিয়ার' কাব্যময় কাহিনীর করুন সমাপ্তি। (আসিয়ার বুকলেট থেকে)

আসিয়ার সাংগঠনিক পরিচিতি নীচে দেওয়া হলো ঃ

প্রযোজনা ঃ নুরুল ইসলাম ও ফতেহ লোহানী (পূর্বাণী চিত্র), চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ ফতেহ লোহানী, কাহিনী ও সংলাপ ঃ নাজীর আহমদ, চিত্রগ্রহণ ঃ এম জামান সুরারোপ ও সামগ্রিক নির্দেশনা ঃ আব্বাস উদ্দীন আহমদ, সংগীত ঃ আব্দুল আহাদ, গীতিকার ঃ আব্দুল করিম, মোবারক ও সংগ্রহ। কণ্ঠশিল্পী ঃ ফেরদৌসী বেগম (রহমান), মাহবুবা রহমান, হুসনা বানু খান, রওশন আরা বেগম, শামষুনাহানর করিম, মোস্তফা জামান আব্বাসী, হাজেরা বিবি, ও আবদুল হালিম।

সম্পাদনা ঃ আশু ঘোষ, শব্দ গ্রহণ ঃ এম, হোসেন, শিল্প নির্দেশনা ঃ হাসান আলী, অপটিকস ঃ লুৎফর রহমান, মুদ্রণ ঃ কায়সার রিজভী, রূপসজ্জা ঃ শমশের আলী, স্থিরচিত্র ঃ শামসুদ্দীন (ক্রাউন ষ্টুডিও), নৃত্যপরিচালক ঃ জি.এ মান্নান, নৃত্যশিল্পী ঃঝর্ণা (শবনম), কামাল লোহানী, জ্যাকর, আলতামাল, প্রমুখ।

প্রচার ঃ কার্মাট, পরিবেশনা ঃ পাকিস্তান ফিল্ম ট্রাষ্ট, অভিনয় ঃ সুমিতা, শহীদ কাজী সালেহ, রণেন কুশারী, ভবেশ মুখার্জী, সোনা মিয়া, মাধুরী চ্যাটার্জী, সিতারা সাত্তার (আয়েশা আখতার), শিরিন বেগম, মেসবাহ উদ্দীন, বেবী রুবী, মাষ্টার সেলিম প্রমুখ।

মুক্তি ঃ ০৪ নভেম্বর, ১৯৬১

'আসিয়া' চলচ্চিত্রে গান রয়েছে মোট ৬টি। গানগুলোর প্রথম চরণ হচ্ছে (১) বিধি বইসা বুঝি নিরলে, (২) দেওয়ায় করছে মেঘ মেঘালি, (৩) আমার গলার হার খুলে নে, (৪) ও মোর কালারে কালা, (৫) ধান ভানি আমি নারী, (৬) পাগলা পীরের দরগায়।

'আসিয়া'র নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৫৭ সালের ২০ মে থেকে নবনির্মিত এফডিসির এক নম্বর ফ্লোরে। কিন্তু মুক্তি পায় ১৯৬০ সালের ৪ নভেম্বর প্রদেশের তিনটি হলে: নিশাত (ঢাকা), উল্লাসিনী (খুলনা) ও জগদীশে (বরিশাল)। সে সপ্তাহে এবং পরবর্তী সময়েও এটি প্রদর্শনের সময় প্রদেশের অন্যান্য হলে চলছিল বাণিজ্যিক ভারতীয় ও পাকিস্নানী ছবি। উপরন্তু কয়েকদিন আগেই প্রদেশের পর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল দিয়ে বয়ে গেছে প্রচন্ড ঝড়। এমন পরিস্থিতিতে ছবিটি ব্যবসায়িক দিক দিয়ে সফলতা লাভে ব্যর্থ হয়। মুক্তির দিন এ ছবি সম্পর্কে সাপ্তাহিক চিত্রালীতে লেখা হয়-

'আসিয়া'য় প্রাণ পেয়ে উঠেছে দেশের বিশাল আকাশ, উদার মাঠ, কলহারা নদী, আর সবুজ স্রোত মাঠ বনরাজি, প্রান স্পন্দনে দুর্লভ সৃষ্টি হয়ে উঠেছে একেকটি ফ্রেম। শিল্পী ফতেহ লোহানী, পথিকৃত ফতেহ লোহানী, ধ্যানী স্রষ্টা ফতেহ লোহানী দেশ মানুষের অজস্র অভিনন্দন আজ তোমার জন্য। ২২

মুক্তির পর প্রদেশের প্রায় সবক'টি পত্র-পত্রিকা এবং বিদগ্ধ মহল কর্তৃক 'আসিয়া'য় বিষয়বস্তু নির্মাণ কৌশল, লোকজ ঐতিহ্যের ব্যবহার-ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর প্রশংসাসচক বাক্য উচ্চারিত হয়। 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় 'আসিয়া'কে বলা হয় "এ রুরাল ট্র্যাজেডী" ।২৩

সাপ্তাহিক চিত্রালীর সমালোচক "একটি স্মরনীয় চলচ্চিত্র" শিরোনামে লিখেন-

'.... অন্ধকারে আকাশে সর্যোদয়ের প্রথম কিরণ 'আসিয়া'। ঐতিহ্য, মনভাব ও ভাষার হয়ে, জীবনবোধে, চলচ্চিত্র ভাষার ব্যবহারে 'আসিয়া' এমন একটি ছবি। চলচ্চিত্র সেখাণ থেকে যথার্থ অর্থে আমাদের চলচ্চিত্র ইতিহাস শুরু হলো।.... স্রষ্টা

মনের হাতিয়ার করে নেয়ার ক্ষমতা লক্ষ্য করে বলব পরিচালক ফতেহ লোহানী স্রষ্টা পরিচালক হিসেবে সমগ্র দেশে পথিকৃৎ।... কাহিনী মানবিক মল্যে অনুপম এবং ছোটোখাটো তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার ভেতর দিয়ে একটা অখন্ড গভীরতায় সৃষ্টি সাফল্যে উজ্জ্বল। চরিত্রগুলো নেয়া হয়েছে অত্যন্ত চেনা মহল থেকে। কিন্তু কখনোই তা টিপিক্যালিটির আওতায় গিয়ে পড়েনি।

পরিচালক ফতেহ লোহানীর ব্যক্তিগত সৃষ্টির স্বাক্ষর ছবির প্রতিটি ফ্রেমে কি কম্পোজিশনে কি আলোক বিন্যাসে কি চরিত্র চিত্রণে। এই অন্তরাল উপস্থিতি হয়ত কিছুটা মাত্রাধিক কিন্তু তবু খুশী হই, স্রষ্টার অহম-এর সাক্ষাৎ পেয়ে যে অহম একজন মানুষকে সাধারণ থেকে স্রষ্টার পর্যায়ে উন্নীত করে।
তাঁর এ চলচ্চিত্রে এমন একটি শব্দ, বর্ণ ও সংগীতময় পৃথিবীর সন্ধান পেলাম যা একান্ত আমাদের পৃথিবী। চিত্র ভাষার মনোযোগী ব্যবহার কখনো কখনো কুড়ল মারা বা খাসির কলেজে টেনে বের করার মতো নিষ্ঠুর অথচ সুন্দর কাজের জন্ম দিয়েছে, এবং সারা ছবিতে এমনি একটি শটের জন্ম দিয়েছে যা প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ, একথা বলতেও আমার দ্বিধা নেই।

আমি বলছি, ছেলেবেলার আসি মাসুর রেললাইন স্লিপারে লাফালাফির সময় সেই কিছুক্ষণ সামনাসামনি অনুসরণ করার পর এক সময় ক্রমাগত পিছিয়ে আসা ব্রিজের ভেতর দিয়ে এবং তার পরেই তাদের দু'জনের পায়ের ওপর একটি ক্লোজ আপে ফিরে যাওয়ার শটটির কথা।... তারপর ক্রমাগত পিছিয়ে আসা এবং ফলে দুটি ছেলে-মেয়ে ছোট হতে হতে দিগন্তে বিন্দু হয়ে যাওয়া, পেছনে ক্রমাগত দিগন্তের বিস্তার লাভ এবং সম্মুখে ব্রিজের দুই প্রান্তে একের পর এক আবির্ভাব ও পেছনে চলে যাওয়া- সব মিলিয়ে এমন এক বেদনা ও অশ্রুর একটি ক্ল্যাসিক ট্রাজেডির নীল আভাস এঁকে দিয়ে গেল যা যে কোনো দর্শকের আজীবন মনে থাকবে। এবং তারপরই যখন তাদের পায়ের ওপর ক্লোজআপপে ফিরে এলাম তখন যেন চরিত্র দুটোর সংগে আমাদের নৈকট্য এক নিমিষে নিকটতম হয়ে উঠল। ব্যাকরণকে উপেক্ষা করে উপলব্ধির বিশালতায় ও ইংগিতের সুক্ষ্মতম প্রয়োগে এ শট গৌরব হয়ে থাকতে পারে। আমাদের দুঃখ হয় এমন একটি কাজের অমান কাজ এ ছবিতে আর নেই বলে।

পরিচালক হিসেবে ফতেহ লোহানীর উচিত ছিল সম্পাদনা আরো নিবিড় করে তোলার নির্দেশ দেয়। যার ফলে কোন কোনো অদৃশ্য অনাবশ্যক রয়ে গেছে।... মেলার দৃশ্যটি একেবারে রাখা উচিত ছিল না।

*.... এ ছবির পটভমি, বিন্যাস ও সামগ্রিক পরিকল্পনা বাংলার চিরন্তনী কাব্যিক গুণে কোমল। .. অভিনয় ক্ষেত্রে সবাই ভালো করেছেন-অন্তঃ সবাই নিজ নিজ চরিত্রে আমাদের বিশ্বাস করেছেন। সুমিতা, শিরিন ও কাজী খালেক এই তিনজন এখন পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্ধী। অভিনয় শিল্পী বলেই নিজ নিজ কাজে প্রমাণ করেছেন। বিশেষ করে নবাগত হিসেবে পাগলীর চরিত্র শিরিন অপর্ব। ঠিক তেমনি ফতেহ লোহানী, নাজীর আহমদ ও আব্দুল আহাদ এ ছবির পর নিজ বিভাগে শ্রেষ্ঠ একথা বলতে দ্বিধা নেই।'*২৪

'আসিয়া রোমের শিল্প প্রদশর্ণী (চিত্রালী, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০, পৃঃ ১)* । বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব(চিত্রালী, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১ পৃষ্ঠা-৮)। নয়াদিল্লী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে(চিত্রালী, ৩১ মার্চ, ১৯৬১ পৃষ্ঠা-১৬) অংশগ্রহণের সংবাদ প্রচারিত হয়। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য ছবিটি সরকারিভাবে মনোনীত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এসব ব্যাপারে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে 'আসিয়া' রেকর্ড সৃষ্টি করে শ্রেষ্ঠ বাংলা চলচ্চিত্র হিসেবে পাকিস্তানের 'প্রেসিডেন্ট পদক' ও করাচীর নিগার পত্রিকার পুরস্কার পায় ১৯৬১ সালের মে মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফতেহ লোহানী প্রেসিডেন্ট পুরস্কার গ্রহণ করেন।(চিত্রালী, ২ জুন, ১৯৬১ পৃষ্ঠা-১)।

আকাশ আর মাটি (১৯৫৯)

ফতেহ লোহানী পরিচালিত দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ‘আকাশ আর মাটি’ । প্রথম ছবি ‘আসিয়া’ মুক্তি পাওয়ার আগেই তিনি শুরু করেন তাঁর দ্বিতীয় ছবির কাজ। আর সুমিতা দেবীর অভিনীত দ্বিতীয় ছবি আকাশ আর মাটি। এ ছবির লক্ষ্যনীয় ব্যাপার এতে কলকাতার শিল্পী কুশলীদের অংশহন। এতে কলকাতার একজন কাহিনীকার, একন অন্যতম অভিনেতা ও একজন অভিনেত্রী, দু’জন গীতিকার ও কয়েকজন সংগীত শিল্পী জড়িত হন। অনুপম হায়াৎ রচিত ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস’ (১৯৮৭),এবং একই লেখক রচিত ‘ফতেহ লোহানী’র (১৯৯৩) জীবনী গ্রন্থ হতে আকাশ আর মাটি ছবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

কাহিনী সংক্ষেপ

ভোর হয়, আলো আঁধারের স্দ্ধ স্মিত ছায়ায় আকাশ আর মাটির তফাৎ যেন বোঝা যায় না। প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে পল্লীর একটুকরো পটভুমি। জ্বলন্ত সর্য আকাশের গায় ধ্রুবপথের ইশারা তখনও আঁকেনি। গাছের তলায় বসে আপনভোলা এক রাখাল বাজায় বাশি, সর্য-ওঠার পর্বরাগে তার বাঁশীর সুর কেঁপে কেঁপে যায় কোন এক মিতালীর আমেজে। নোতুন সকালের আয়োজনে প্রকৃতির বুকে চলছে অপর্ব সংগীতের মুর্চ্ছনা, ছন্দের আলোড়ন, এই মাধুয্যের মধ্যে আত্মসমাহিত হয়ে বসে আছে কিশোর শায়েদ। কিশোরের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে জাগছে অলব্ধ সঙ্গীতকে পাওয়ার অনুপ্রেরণা ।.......

ওদিকে ঘরে শায়েদের ছোট ভাই শাকিল পড়াশোনায় ব্যস্ত। শায়েদ আর শাকিল গ্রামের মধ্যবিত্ত জোতদার শেখ ওসমান আলীর দুই ছেলে। ওসমানের ছোট, দুই ছেলে, স্ত্রী ও স্ত্রীর পিত্রালয়ের পুরোনো এক চাকর জমুকে নিয়ে। জমুর অবস্থা ঠিক সাধারণ ভৃত্যের মতো নয়, ও এ বাড়ির অভিভাবকও। সংসারের সাতে পাঁচে জমুর প্রবাব অনেকখানি অনুভুত হয় সব সময়। জমু ভালবাসে এ বাড়ির সবাইকে, কিন্তু সবচেয়ে বেশী পক্ষপাতিত্ব বোধহয় তার শায়েদের ওপর-শায়েদের জন্যে স্নেহ তার অগাধ।......

একদিন স্কুলের ফলাফল বেরুলো শায়েদের প্রতিকূলে। বাবা আর মায়ের রোষ, বিশেষ করে মায়ের রুদ্ধ অভিমানের দাপট সমস্টা ফেটে পড়লো শায়েদের ওপর। সেইদিন রাত্রেই শায়েদ করলো গৃহত্যাগ। ভোরের শুকতারার হাতছানিতে সে বেরিয়ে পড়লো অজানার পথে....... ।

অনাগতের তন্মতায় পথে এগিয়ে চলে কিশোর শায়েদ। এসে পৌঁছুলো ঢাকা শহরে। শায়েদ দেখলো প্রলুব্ধির পদধ্বনি চলছে সেখানে। ক্ষুধাক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত শায়েদ ঘুরে ফেরে পথে পথে। শহরে সন্ধ্যা নামে।.....

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোরগোল পড়ে যায় ঢাকার এ্যাডভোকেট আমিনুল্লাহ সাহেবের বাড়িতে। বাড়ির বোয়াকে রুগ্ন অবস্থায় এক অজানা কিশোরকে তাঁরা আবিস্কার করলেন।...
তারপর দীর্ঘ বারো বছর কেটে যায়।--

আমিনুল্লা সাহেবের পরিবারে শায়েদ লালিত হতে থাকে। সাথী জুটল আমিনুল্লাহর একমাত্র কন্যা মিলা। মিলার মার স্নেহ ও মিলার গভীর অনুরাগে শায়েদের সঙ্গীত সাধনা চলতে থাকে অনাবিল গতিতে। কিন্তু শায়েদের আসল পরিচয় থেকে যায় গোপন, গৃহত্যাগী, অভিমানী শিল্পীর হৃদয়ের মনিকোঠায়। যেদিন শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবে, শুধু সেইদিনই সে আত্মপরিচয় দেবে সবার সামনে সগৌরবে-এই ছিল তার কঠোর ব্রত।

ওদিকে শায়েদের ছোট ভাই শাকিল রীতিমতো পাশের পর পাশ দিয়ে ঢাকায় মোশ্লেম হল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে। একদিন জীবনের পরম পরীক্ষার লগ্ন এগিয়ে এলো শাকিলের সামনে। তথাকথিত উঁচুস্তরের জীব

“ড্যাডির” একমাত্র কন্যা রুহীর আসক্তিময় নীহারিকার ঝলমলে নীল রাজত্বে পথ হারালো শাকিল। রুহী ভালোবাসে শাকিলকে।

শাকিল আর রুহী, মিলা আর শায়েদ সবার অলক্ষ্যে আকাশ আর মাটির সীমানায় যে জগৎ গড়েছিল সে জগৎপটে হঠাৎ একদিন এক অদৃশ্য শিল্পীর তুলির গভীরে রেখায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো ছায়ানট রাগ, নিষাদহীন আরোহে মিশলো গিয়ে বিদায়ের বেহাগে।...... (আকাশ আর মাটির বুকলেট থেকে)

‘আকাশ আর মাটি’ ছবিতে বেশ কয়েকটি গান রয়েছে। গানগুলোর প্রথম চরণ হচ্ছে (১) গুরু দয়া করো, (২) মুর্শিদ দাও দেখা দরদী (৩) এ মায়রী গোঙ্গম (৪) সুদর ওগো, পথিক তোমার (৫) এই পৃথিবীতে তবে কি আমার (৬) আমার মনের মানসী (৭) তুমহারী কারণ (৮) সাহেব যত দিলওয়ালা ও (৯) চল আজ যাই মোরা

‘আকাশ আর মাটি’র সাংগঠনিক পরিচিতি নীচে দেয়া হলো ঃ

প্রযোজনা ঃ মোহাম্মদ শামীম ও ধীরেন্দ্র মোহন সাহা (আজলী ফিল্মস), চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ ফতেহ লোহানী, কাহিনী ও সংলাপঃ বিধায়ক ভট্টাচার্য, চিত্রগ্রহণ ঃ বেবী ইসলাম ও এম, জামান, সংগীত পরিচালনা ঃ সুবল দাস, গীতিকার ঃ হরেন রায় চৌধুরী, ফতেহ লোহানী, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, হারুন-অর-রশীদ, কণ্ঠ সংগীত ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আল্পনা বন্দোপাধ্যায়, বানী ঘোষাল, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মমতাজ আলী প্রমুখ। সম্পাদনাঃ প্রণব মুখোপাধ্যায়, শব্দগ্রহণ ঃ এম, হোসেন, শিল্প নির্দেশনা ঃ হাসান আলী, মুদ্রণঃ কায়সার রিজভী, রূপসজ্জা ঃ শমসের আলী, স্থিরচিত্রঃ শামসুদ্দীন (ক্রাউন ষ্টুডিও), পরিবেশনাঃ পাকিস্তান ফিল্ম ট্রাষ্ট।

অভিনয়ঃ প্রবীর কুমার, সুমিতা লাহিড়ী, রূপা মুখার্জী, আমিন, মালেক খান, দাগু বর্ধন, আলী সাহেব, জিনাত বেগম, মাহমুদ, মাধুরী চ্যাটার্জি, রেজা, টিপু, টুই, তেজেন চক্রবর্তী, সোনা মিয়া, এফ করীম, রাশিদুল হাসান, রবিউল, রহিমা, রফিকুদ্দিন, রণেন কুশারী, বি. মালিক, মনসুর প্রমুখ।

মুক্তিঃ ২৪ জুলাই, ১৯৫৯

ছবির মুক্তিলগ্নে প্রচারপত্রে বলা হয় ঃ

“পর্ব বাংলার সংগীত মুখর” বাণীচিত্রা ও পর্ব পাকিস্তানের ছায়াচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি অনন্য শিল্পকীর্তি।”

‘আকাশ আর মাটি’ মুক্তি পায় ভারতীয়, পাকিস্তানী (উর্দ, পাঞ্জাবী) ও বিদেশী ইংরেজী ছবির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে।ফলে ছবিটি আশানুরূপ ব্যবসায়িক সাফল্য পায়নি। তবে ছবিটি পত্র-পত্রিকার সমালোচকদের সৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

এ ছবি সম্পর্কে এহতেশাম হায়দার চৌধুরী ‘দৈনিক ইত্তেফাক’-এ ১৯৫৯ সালের ৩০ জুলাই প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলেন-

‘কোলকাতার তৈরী অনেক ছবির চাইতে ‘আকাশ আর মাটি’ বহুলাংশে সার্থক হয়েছে।

দৈনিক আজাদ এ একই তারিখে লেখা হয়........।

ছায়াছবি তৈরীর ট্র্যাডিশন বর্জিত পর্ব পাকিস্তানে সম্পর্ণভাবে প্রস্তুত ‘আকাশ আর মাটি’ এদেশে বাংলা ছবি নির্মাণের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইংগিত বহন করে।[২৫]

এ ছবি মুক্তির পর তৎকালীন পুর্ব বঙ্গের দর্শকরা ভারতীয় খ্যাতিমাল চিত্রতারকাদের সংগে (প্রবীর, রূপা) নবাগত অভিনেত্রী সুমিতার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়। ২৬

এদেশ তোমার আমার (১৯৫৯)

নায়িকা হিসাবে সুমিতা অভিনীত ৩য় চলচ্চিত্র এদেশ তোমার আমার মুক্তি পায় ১৯৫৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর। এ ছবি পরিচালনা করেন এহতেশাম। দেশপ্রেম মুলক এছবির শাহানা চরিত্রে সুমিতা অভিনয় করেন।

এ ছবির কাহিনী হচ্ছে ঃ

এর নায়ক হারুন একজন রাজবন্দী। সে জেল থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ছাড়া পেয়ে সে গ্রামে জনসেবামুলক কাজ করতে গিয়ে জমিদারের বাধার সম্মুখীন হয়। জমিদারের ভাইঝি শাহানার সংগে প্রেম-বাঁধা, শেষে মিলন। এ ছবির বিজ্ঞাপনে দিল্লীর বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী পান্নার কথা ফলাও করে প্রচার করা হয়। বি,এ, খান প্রযোজিত ‘লিও ফিল্মস’ পরিবেশিত এ ছবিতে অভিনয় করেন সুমিতা, আনিস (খানআতা),রহমান, সুলতান, মাধুরী, স্বপ্না, সুভাষদত্ত, মেজবাহ প্রমুখ। কণ্ঠ সংগীতে অংশ নেন মাহবুবা রহমান, ফেরদৌসি রহমান, আবদুল লতিফ, আবদুল আলীম, সোহরাব হোসেন, রওশন হোসেন, ফরিদা ইয়াসমীন প্রমুখ। এ ছবির মাধ্যমে খান আতাউর রহমান সংগীত পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ছবির চিত্রগ্রহণে ছিলেন কিউ,এম জামান। সম্পাদনায় বশির হোসেন, শিল্প নির্দেশণায় হাসান আলী। জহির রায়হান ছিলেন এ ছবির সহকারী পরিচালক এবং অন্যতম গীতিকার।২৭

ধুপছাঁও

সুমিতা পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উর্দূ ছবি ‘ধুপছাঁও’(১৯৬০) এর নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন। উর্দূ ভাষায় নির্মিত এ ছবির শূটিং ঢাকা তথা বাংলাদেশে হয়েছিল। এ ছবিতে তাঁর বিপরীতে নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন পশ্চিম পাকিস্তানের খ্যাতিম্যান অভিনেতা এজাজ।

কখনো আসেনি (১৯৬১)

সুমিতা অভিনীত ‘কখনো আসেনি’ মুক্তি পায় ১৯৬১ সালে। এ ছবির মাধ্যমেই সাহিত্যিক জহির রায়হান প্রথম একক চিত্র পরিচালক হিসেবে আবির্ভূত হন ১৯৬১ । সুমিতা এছবির মরিয়ম বা মেরি চরিত্রে অভিনয় করেন।

আজিজুল হক ও মঞ্জুরুল হক (লিটল সিনে সার্কেল) প্রযোজিত এ ছবির সুরকার খান আতাউর রহমান এবং চিত্রগ্রাহক কিউ, এম জামান। ছবিতে যৌথভাবে শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন হাসান আলী ও আবদুস সবুর। সুমিতা, ঝর্ণা(শবনম) আনিস (খান আতা), সঞ্জীব দত্ত, মেসবাহ, নারায়নচক্রবর্তী, আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম, শহীদুল আমীন, অনিমা প্রমুখ ছবিতে অভিনয় করেন। জহির রায়হান রচিত ছবির গানে কণ্ঠ দেন কলিম শরাফী, মাহবুবা রহমান ও খান আতাউর রহমান। ‘কখনো আসেনি’ মুক্তি পায় ১৯৬১ সালের ২৪ নভেম্বর। এ ছবি নির্মানের পেছনে রে

ছবির বিজ্ঞাপনে বলা হয় ‘দেশের জনসাধারণ বিশ বছর পরে যে ছবি দেখবে বলে আশা করেছিল বিশ পর আগেই দেশের তরুনরা সে ছবি তাদের উপহার দিল।’২৮

ছবির কাহিনী নিম্নে দেওয়া হলো

শিল্পী জীবনের আর্তি তুলে ধরা হয়েছে ছবির কাহিনীতে। একজন শিল্পী ও তার দুবোন একসংগে রহস্যজনকভাবে মারা যায়। একই বাড়িতে বাস করতে আসে আরেক শিল্পী শওকত ও তার দুবোন। তাদেরই পাশাপাশি থাকে অদ্ভুত চরিত্রের

ধন্যাঢ় এক লোক সুলতান। সুলতান শিল্পকর্ম ও আশ্চর্যজনক জিনিষপত্র সংগ্রহ করে থাকে। তার সংগৃহিত তালিকায় রয়েছে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে এক অমর মেয়ে মরিয়ম বা মেরি । শিল্পী ওই মরিয়ম এর ছবি আঁকতে চায়। নিজের কাছে পেতে চায়। কিন্তু সুলতান বলে যে, সৌন্দর্যকে কাছে পাওয়া যায় না, অনুভব করা যায়।অবশেষে একদিন সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের মোহে আবিষ্ট শিল্পী শওকত এবং তার দুবোন আগের শিল্পী ও দুবোনের মতো আত্মহত্যা করে । সময় এগিয়ে চলে। কিন্তু পুলিশ কোন এ আত্মহত্যার কোন সুরাহা করতে পারে ন।২৯

এ ছবির সামালোচনা প্রসংগে মাসিক 'পূবালী' পত্রিকায় লেখা হয় ঃ

'কাহিনীর বক্তব্য উন্মোচনে দুই প্রতীক চরিত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, একটি মরিয়ম(সুমিকতাঘ, অপরটি খেয়ালী ধনী (সঞ্জীব)। কাহিনীকার জহির রায়হানে চমৎকার সৃষ্টি দুটি চরিত্র। এ দুটি চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ-সম্ভাবনা ছিল অনেক। সুমিতা-সঞ্জীব তার সুযোগ গ্রহণ করেছেন আংশিকভাবে। ৩০

সোনার কাজল (১৯৬২)

সুমিতা অভিনীত 'সোনার কাজল' মুক্তি পায় ১৯৬২ সালের ২৯ জুন। এ ছবিটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন জহির রায়হান ও কলিম শরাফী। এ ছবিতে আরও অভিনয় করেন মীনা (সুলতানা জামান), কাজী খালেক, খলিল, পূর্ণিমা, ইনাম আহমেদ, জিন্নাত গনি, মালেক, সুব্রত মাওলা, রহিমা, সুভাষ দত্ত প্রমুখ।

এ ছবির হাসু চরিত্রে অভিনয় করেন সুমিতা। তাঁর অভিনয় সম্পর্কে পত্রিকায় লেখা হয় যে, হাসু চরিত্রে সুমিতা অভিব্যক্তিতে সুন্দর, কিন্তু উচ্চারণে পীড়া দিয়েছেন। ৩১

কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩)

নায়িকা হিসেবে সুমিতা অভিনীত আরেকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হলো জহির রায়হান পরিচালিত 'কাচের দেয়াল'। এফডিসি নির্মিত হওয়ার পর ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত যে কটি ছবি নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবি হচ্ছে 'কাঁচের দেয়াল'। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৬৩ সালের ১৮ জানুয়ারি। 'কাঁচের দেয়াল' ছবির বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, ও কারিগরী নৈপুণ্য সে সময় নির্মিত ছবির মধ্যে নানা কারণে সম্পূর্ণভাবে আলাদা ধরণের।

কাহিনী সংক্ষেপ

নানা কারণে অসহায় এক তরুনী হাসি মামার বাড়িতে লালিত পালিত। মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা হয়ে যায় বাউন্ডেলে। মামার পরিবারে মেয়েটির লাঞ্ছনা গঞ্জনার শেষ নেই। তবে, এব মামা এবং মামাতো ভাই তাকে আলাদা চোখে দেখে। মেয়েটি হঠাৎ করে লটারীতে প্রচুর টাকা পেয়ে যায়। এ সময় মামার পরিবারে তার আদর-যত্নও বেড়ে যায়। কিছুদিন পরই সংবাদ আসে যে লটারী মিথ্যে। মেয়েটির ভাগ্যে আবার দুর্ভোগ নেমে আসে। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করে এবং বাড়ি থেকে কাঁচের দেয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে।

এ ছবির প্রযোজক, কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ছিলেস জহির রায়হান। সংগীতে খান আতাউর রহমান, চিত্রগ্রহণে আফজাল চৌধুরী। ছবিতে অভিনয় করেন ঃ সুমিতা, রাণী সরকার, আনিস (খান আতা), আনোয়ার হোসেন, ইনাম আহমদ, আসিয়া, বি,এ মালেক, পূর্ণিমা সেন, মহিন, খায়ের।

কাঁচের দেয়াল ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান চলচ্চিত্র উৎসবে ৯টি পুরস্কার পায় । জহির রায়হান শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মানসহ কয়েকটি পুরস্কার পান। আর নায়িকা সুমিতা পান শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার।৩২

এইতো জীবন (১৯৬৪)

অন্যতম নায়িকা হিসাবে সুমিতা অভিনীত আরেকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হলো 'এইতো জীবন'। এ ছবির কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা জিল্লুর রহিম এর। সুমিতা ছাড়াও এ ছবিতে অভিনয় করেন রোজী, শওকত আকবর, কাজী খালেক, রহমান, হোসনে আরা, নাজনীন , বিলকিস বারী, রাণী সরকার, মেজবাহ, মুস্তফা।

সংগম (১৯৬৪)

চিত্রশিল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছবি হচ্ছে জহির রায়হানের সংগম (১৯৬৪)। তৎকালীন সারা পাকিস্তানে এটিই ছিল প্রথম রঙিন ছবি। এছবির দুই নায়িকার একজন হিসাবে অভিনয় করে সুমিতা ওই সময় সারা পাকিস্তানে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। এছবির ট্রেজিক চরিত্র শিলার ভূমিকায় তার আবেগঘন অভিনয় সেকালের অনেক দর্শককে কাদিয়েছিল। ছবিতে তার বিপরীতে নায়ক ছিলেন খলিল। ছবির অপর দুই চরিত্র ছিলেন হারুন ও রোজী।

পাকিস্তান শিল্প ব্যাংকের সহায়তায় এই ছবি নির্মিত হয়। বেশিরভাগ আউটডোরে চিত্রায়িত এই রঙিন ছবির চিত্রগ্রহণ করেন আফজাল চৌধুরী আর প্রসেস করেন এফডিসির তরুন কুশলী খালেদ সালাহউদ্দিন।

ছবির কাহিনী খুবই সাধারণ। একজন অধ্যাপকের নেতৃত্বে শহীদ ও একদল ছাত্র ছাত্রী ভ্রমণ করতে যায় এক স্থানে। ওখানে শহীদের দেখা হয় পুরনো বন্ধু শংকরের সংগে। শংকর হোটেল চালায় । ওখানে আরেকটি হোটেল চালায় শিলা নামে এক মেয়ের চাচা। শংকরের মা ও শিলার চাচার মধ্যে ব্যবসায়িক কারণে দ্বন্ধ থাকলেও এই দুই তরুন-তরুনী একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসে। তাদের এই প্রেমে বাদা হয়ে দাঁড়ায় এক মন্দলোক। অন্যদিকে শহীদ ও তার দল শিলা ও শংকরকে সহায়তা দেয়। ঠিক এ সময় নিশাত নামে এক তরুনীর সংগে পরিচয় ঘটে শহীদের। পরিচয় থেকে দুজনের প্রেম। পরিচয় থেকে দু'জনের প্রেম। ঘটনার আবর্তে শংকর ও শিলা নিহত হয়। এই বিষাদের মধ্যেও শহীদ-নিশাতের বিয়ে হয়।

রোজী, হারুন, সুমিতা, খলিল, বদরুদ্দীন, মায়া দেবী, রাণী সরকার, আনোয়ারা, জাভেদ, আবুল খায়ের প্রমুখ অভিনীত এ ছবিকে সমালোচকরা রঙিন বিনোদন বলে আখ্যা দেয়। ছবির শায়লা চরিত্রে সুমিতা ও শংকর চরিত্রে খলিলের ট্র্যাজিট অভিনয় সারা দেশে আলোচিত হয়।৩৩

সংগম সম্পর্কে করাচীর 'ইস্টার্ণ ফিল্ম' পত্রিকায় ১৯৬৪ সালের মে সংখ্যায় লেখা হয় ঃ

`Songam Good colourful entertainment

Uptil now the confilct between old and young hearts has been depicted from the point of view of the older generation on but probably for the first time on our screen this problem has been dealt with, from the view point of the younger people. The credit for this should go to Zahir Raihan the writer, director and producer who took all the risks in making such an ambitious venture. The Industrial Development of Pakistan should be praised for helping the producer finacially.

Good colours

Sangam, the picture under review, is the first full length colour feature film of Pakistan. Except for two or three scenes, colour photography is excellent and some of the outdoor scenes can be comared to those of any foreign film. In India, where as sangam was not only processed in Dhaka but the man in charge is a young Pakistani, Khalid Salahuddin incharge of processing and Afzal Chowdhury, the photographer deserve credit for this remarkable achievement. Almost the whole of the picture is filmed outdoors and has exploited the picture seque scenes of East Pakistan.

Entertainment

Sangam is an entertaining picture. It gones not give you not give you lessons in morality nor doses it deal with the acute problems of our societies. The first half is full of comic scenes while the latter one is packed with adventures and the picture ends with a tragic note. This is because the director wanted to make a picture which could suit the taste of all types of cine-goers.

Music below average

Music which is the backbone of such pictures is quite disappointing. One of the Songs is quite catchy and it will become popular. Even background music is not up to the mark. If such beautiful scenes would has been coupled with good background music the effect would bave been much better.
Go and see her father, who is pundit in a temple which is situated in a dense jungle. This followed by adventure. The party meets Sheila's father who decades to accompany them back, as he is not in favour of the marriage. The way back is very difficult. All the people return back but Shahid and Shanker are left to save Nishat who is captered by cannibals. They are successful in doing so but Shanker is struck by an arrow and he dies on his way back.
Sheila is so shocked that she loses her balance of mind and is killed by the villain when she wants to kill him. The lovers are united after death. In the meantime Shahid and Nishat get married.

Good performances

Haroon as Shahid and khalil as Shankar are quite convincing. New comer Rosy is a very potential artite all she require is a bit of grooming. But the most polished performance comes from Sumita who as Sheilla impresses the audience. At the end of

the picture her acting is at its climax, rests of the artistes have also played their respective roles well. There is no over acting in the film.
Thus sangam with all its merits is worth-seeing picture and it has put East Pakistan's infant film industry on a higher pedestal. 34

তানহা (১৯৬৪)

সুমিতা অভিনীত আরেকটি চলচ্চিত্র হচ্ছে 'তানহা'। উর্দূ ভাষায় নির্মিত এ ছবির পরিচালক প্রখ্যাত ক্যামেরা ম্যান বেবী ইসলাম। । বহুল আলোচিত এই ছবির কাজ শুরু হয় ১৯৫৯ সালে, ছবিটি সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায় ১৯৬১ সালে আর মুক্তি পায় ১৯৬৪ সালে। এরই মধ্যে ছবিটি বিদেশে প্রদর্শিত হয়ে প্রচুর প্রশংসা পায়। ছবির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে জন্ম-পরিচয়হীন সমাজচ্যুত দুঃখী মানুষদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, প্রেম-ঘৃণাকে নিয়ে। পিতৃ-মাতৃহীন জন্ম পরিচয়হীন সেলিম শৈশব থেকে এই সংগে বড় হয় আরেক অনাথ মেয়ে নাজের সাথে। ঘটনার আবর্তে নাজের ঠাঁই হয় নিষিদ্ধ পল্লীতে। প্রেমিক সেলিম নিষিদ্ধ পল্লীর অন্ধকার থেকে নাজকে উদ্ধারের জন্যে প্রচেষ্টা চালায়।

এম, আহমেদ ও এ, হাসান প্রযোজিত এবং বেবী ইসলাম পরিচালিত এ ছবির সংলাপ লিখেন শুরুর বারবাংকভি, গান লিখেন ইসমাত চুঘ-তাই ও ইউনুস আমার। ছবির সংগীত পরিচালনা করেন আলতাফ মাহমুদ। তিনি ছবির গানেও কণ্ঠ দেন। 'তানহা'য় অভিনয় করেন হারুন, শামীম আরা, নায়না, সুমিতা, শবনম, শেখ হাসান, নাসিমা খান প্রমুখ।

সৃজনশীল পরিচালনা, সমাজ সচেতন কাহিনী, বাস্তবানুগ অভিনয়, সুললিত সংগীত মাধুর্যের জন্যে 'তানহা দেশ বিদেশের বিদগ্ধ মহলে প্রশংসা পায়।

বেহুলা (১৯৬৬)

হিন্দু পুরান ভিত্তিক 'বেহুলা' চলচ্চিত্রের মনসা চরিত্রে অভিনয় করে সুমিতা সেকালে আলোড়ন তুলেছিলেন। জহির রায়হান পরিচালিত 'বেহুলা' (আংশিক রঙিন) ছবিটি ১৯৬৬ সালের ২৮ অক্টোবর মুক্তি পায়। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্নান-ভারত যুদ্ধের পর ভারতীয় ছবির প্রদর্শনী সরকারীভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। এর কিছুদিন পরই মুক্তি পায় সালাহউদ্দিন পরিচালিত লোকগাথাভিত্তিক 'রূপবান'। 'রূপবান' প্রচন্ড দর্শকপ্রিয়তা পায়। তখন এ ছবির অনুকরণে ঢাকায় শুরু হয় লোকগাথাভিত্তিক ছবি নির্মাণ। জহির রায়হানও তখন 'রূপবান' এর বাণিজ্যিক সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু পুরাণভিত্তিক লোকগাথা' বেহুলা লখিন্দর'র এর কাহিনী বেছে নেন।

এ সম্পর্কে সুমিতা দেবী লিখেছেন :

'বাহানা'র পর জহির যেন মানসিকভাবে কিছুটা খেই হারিয়ে ফেললো। ছবির বাজারে তখন অন্যরকম হাওয়া। একদিকে উর্দ ছবি, অন্যদিকে রাজা-বাদশার অলীক কাহিনীর ডামাডোল, জহির ওই সময় চলতি হাওয়ার পন্থী হলো। শুরু করলো 'বেহুলার কাজ' (সুমিতা, আমার কথা, তারকালোক, ঈদ সংখ্যা, ১৯৮৫)।

প্রচার পুস্কিায় 'বেহুলা'র সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নরূপে:

'বেহুলা

সতী বেহুলা।

নিছনীপুরের সাই সওদাগরের কন্যা।

সবাই তারা সাপের পজারী।

সেই নিছনীপুরে হরিণ শিকারে এলো লখিন্দর। চম্পক নগরের চাঁদ সওদাগরের সপ্তম সন্তান লখিন্দর। চাঁদ সওদাগর শিবের উপসাক, মনসার বিদ্বেষী। মনসার অভিশাপে চাঁদ সওদাগর ইতিপর্বে তাঁর ছয় পুত্রকে হারিয়েছে সর্পদংশনে। তাই শেষ সন্তান লখিন্দরের সঙ্গে সব সময় থাকে ময়র। ময়র নিয়ে লখিন্দর এলো নিছনীপুরে। সেখানে তার ময়র একটা সাপকে মেরে ফেললো। মনসা রেগে গেল। সাই আতঙ্কে শিউরে উঠলো। লখিন্দর বন্দি হলো সাইয়ের দরবারে। কিন্তু সাই যখন জানতে পারলো, লখিন্দর তারই বন্ধু চাঁদ সওদাগরের পুত্র-যার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে আছে, তখন লখিন্দরকে সাদর সম্ভাষনে নিজ অন্তঃপুরে বরণ করে নিলো সাই সওদাগর। সাইয়ের বাড়িতে লখিনের কাছ থেকে ময়র নাচ শিখলো বেহুলা। ময়র নাচ শিখতে গিয়েই সে বিপর্যয় আনলো।

মনসা ময়র নাচ পছন্দ করে না। তাই, মনসা স্বয়ং এসে প্রতিবাদ জানালো বেহুলাকে, যেন কখনও এ নাচ না নাচে।

কিন্তু বেহুলা মনসার কোন কথাই শুনতে চাইলো না। মসনা রেগে গিয়ে বেহুলাকে তার চরম অভিশাপ দিল-'বাসর ঘরে বেহলা বিধবা হবে, সর্প দংশনে মৃত্যু হবে লখিন্দরের।'

এই অভিশাপে সবাই চমকে উঠলো। সাই সওদাগর বোবা চোখে শুধু তাকিয়ে রইলো। লখিনের মা সনকা কেঁদে লুটিয়ে পড়লো চাঁদ সওদাগরের পায়ে, এ বিয়ে বন্ধ করার জন্য।

কিন্তু চাঁদ সওদাগর অটল। কারো কথাই তার কানে গেল না। চাঁদ সওদাগর ঘোষণা করলো এ বিয়ে হবেই এবং তার জন্য তিনি এমন এক লোহার বাসরঘর তৈরী করবেন, যে ঘরে সর্ষে পরিমাণ ছিদ্রও থাকবে না। তিনি দেখতে চান কী করে মনসার সাপ লখিন্দরের প্রাণ নেয়। শুরু হলো লোহার বাসর ঘরের কাজ। আর বেহুলা লখিন্দরের বিয়ের আয়োজন। বিশু কর্মকার তৈরী করছে লোহার-বাসর ঘর। কোন ছিদ্র নেই তাতে। মনসার চক্রান্তে তবুও একটা ছিদ্র থেকে গেল লোহার বাসর ঘরে।

মনসা বিশুকে ভয় দেখিয়ো সুতা পরিমাণ ছিদ্র রেখে দিল বাসর ঘরে। যথা সময়ে বিয়ে হয়ে গেল।

চাঁদ সওদাগর, সাই সওদাগর সবাই নিশ্চিন্ত। কিন্তু ভবিষ্যৎ খন্ডাবার নয়। মনসার কাল-নাগিনী, ছিদ্রপথে বাসর-ঘরে এসে লখিন্দরকে দংশন করলো। মনসার বেহুলা এ পরাজনয় মেনে নিলো না। সে জানে সে সতী নারী। তার সতীত্বের গুণে সে ফিরে পেতে পারে তার স্বামীকে।

তাই বেহুলা তার মৃত স্বামীকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলো ভেলায়। অজানা, অচেনা ও অনিশ্চিতের পথে শুরু হলো দীর্ঘ বিলম্বিত যাত্রা। সে তার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু কেমন করে???

ষ্টার সিনে করপোরেশনের ব্যানারে নির্মিত ইফতেখারুল আলমের প্রযোজনায়, জহির রায়হানের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায়, নাসের ও আফজাল চৌধুরীর ক্যামেরায়, আলতাফ মাহমুদের সংগীত পরিচালনায়, আব্দুস সবুরের শিল্প নির্দেশনায়, এনামুল হকের সম্পাদনায়'বেহুলা'য় অভিনয় করেন-সুচন্দা, সুমিতা, রাজ্জাক ফতেহ লোহানী, রাণী সরকার, রুবিনা,

অঞ্জন, জাকারিয়া, আমজাদ, সফদর আলী, জয়শ্রী, জাভেদ, রহিম, আভা, শোভা, আলেয়া, রেখা, সেলিনা, আকবর, মওলা, তোফাজ্জল, চাঁদ হারুন প্রমুখ। কণ্ঠ সংগীতে অংশ নেন শাহনাজ বেগম, নীনা হামিদ, কণা, লাভলী, ঝর্ণা, নাজমুল হুদা, আবদুল লতিফ, দিলীপ বিশ্বাস, মাহমুদুন নবী ও আলতাফ মাহমুদ।৩৬

'বেহুলা'র মনসা চরিত্রে সুমিতার অভিনয় সম্পর্কে লেখা হয়

'সুমিতার মনসা মোটমুটি প্রশংসনীয় হলেও মাঝে মাঝে যেন, হিষ্ট্রিরিয়ার লক্ষণযুক্ত'। ৩৭

অভিশাপ (১৯৬৭)

সুমিতা অভিনীত আরেকটি উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হলো অভিশাপ। এ ছবির নাসিমা চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন।

এ ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ : কেশব চ্যাটার্জী। গীত রচনাঃ মোঃ ইউসুফ ও খাজা রিয়াজ। সংগীত পরিচালনা ঃ আশরাফ । নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ঃ আঞ্জুমান আরা, জিনাত রেহানা, মোঃ আলী সিদ্দিকী, নৃত্য পরিচালনাঃ জাবেদ ও হামিদ চৌধুরী। আলোকচিত্র-সাভাক মিস্ত্রী সি, এ, পি। শব্দগ্রহনঃ এ, কে, কোরাইশী। সংগীত গ্রহনঃ মোহসিন। রূপসজ্জা-কাশেম পরদেশী। স্থিরচিত্র: মাসুদ আরমান। ব্যবস্থাপনা ঃ বি, আলম। সহকারী পরিচালনাঃ আল মাসুদ ও মোঃ ইউসুফ। পরিস্ফুটন ও মুদ্রন ঃ বশীর খান। সম্পাদনা-সৈয়দ আওয়াল। সহযোগী পরিচালনা- চাষী নজরুল ইসলাম। প্রযোজনা-শাহেদ আজগার চৌধুরী। কাহিনী সংগঠন ও পরিচালনাঃ রাশেদ আজগার চৌধুরী। পরিবেশনাঃ পাক ফিল্ম কর্পোরেশন।

রূপায়নে : সুমিতা (নাসিমা), শওকত আকবর (আকবর), আনোয়ার হোসেন (সামাদ), রাণী সরকার (আকবরের মা), নবাগতা সুলতানা (নাজ), কালিদাস, কিবরিয়া, রেবেকা, চাষী নজরুল, বেবী, ডিল, ফরিদ, জহীর চৌধুরী, শেফালী, আভা, মিনা এবং ফরিদা (পঃ পাঃ)।

এ ছবির কাহিনী হচ্ছে ঃ

জীবন কবিতার মতোই একটি ছন্দবদ্ধ রূপ। মা, বাপ, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার সমন্বয়ে স্নেহ-মমতার রসসিঞ্চনে নিত্যনতুন আনন্দধারায় তার অগ্রগতি। উচ্ছৃখলতা এখানে অভিশাপ; কারণ, জীবনের এই কাব্য সৌন্দর্যকে এ দেয় ছিন্নভিন্ন করে। আকবরের জীবনেও কি সেই অভিশাপ নেমে এসেছিলো। বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে এসেছে সে, কতবড় চাকরি পেয়েছে। একমাত্র এই সন্তানটিকে নিয়ে বিধবা মায়ের আশা-আকা খার অন্ত নেই। কিন্তু, হায়, তাঁর একমাত্র চোখের মনি আকবর যে বিলেথ থেকে এক উগ্র অত্যাধুনিকা পশ্চিমী জীবনধারার কড়া ছোপ বহন করে এনেছে চরিত্রে, মা কি তা জানতো? আসন্ধ্য নৈশ ক্লাবের রঙীন হই-হুলোড়ের মাঝে কাটিয়ে গভীর রাতে নেশা মশগুল চোখে বাড়ী না ফিরলে আকবরের চোখে আজ আর ঘুম নামে না। মা প্রশ্ন করেন, ছেলে হেসে এড়িয়ে যায়, শঙ্কায় বড় হয়ে ওঠে মায়ের চোখ, ছেলেকে ঘরমুখো করবার একান্ত আগ্রহে অবশেষে মা নাসিমাকে ডাগর-কালো চোখের নীরব আকুতি, অপরদিকে নর্তকী নাজির মোহাম্মদির কটাক্ষের দুর্দাম আহবান-মাঝখানে আকবর! তারপর? ৩৮

অপরিচিতা (১৯৬৮)

সৈয়দ আওয়াল পরিচালিত অপরিচিতা ছবিতে সুমিতার অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়। লেখা হয় *'অভিনয়ের কথা বলতে গেলে সুমিতা দেবী ও আনোয়ার হোসেন এর অভিনয় সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী।'* ৩৯

অন্যত্র লেখা হয় *আজমল ফিল্মস এর অপরিচিতায় সুমিতা দেবীর অভিনয় ভাল লাগেনি এমন দর্শক খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুর্ব পাকিস্তানে সিনেমা শিল্প গড়ে ওঠার মুখে যখন নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করার মতো মেয়ে পাওয়া যাচ্ছিল না সেই বিনতাকালে সুমিতার আর্বিভাব এ দেশের চলচ্চিত্র শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে বৈকি। শিল্পীর অভিনয় দক্ষতা আজও অম্লান।'*৪০

সুমিতার চলচ্চিত্র পঞ্জীঃ

এক নজরে সুমিতা অভিনীত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ঃ আসিয়া (১৯৫৭-৬০), আকাশ আর মাটি (১৯৫৯), এদেশ তোমার আমার (১৯৫৯), নবারুন (১৯৫৯), কখনো আসেনি (১৯৬১), যে নদী মরুপথে(১৯৬১),সোনার কাজল(১৯৬২), কাঁচের দেয়াল

(১৯৬৩), সংগম (১৯৬৪), ধূপছায়া (?), এইতো জীবন (১৯৬৪), দুই দিগন্ত (১৯৬৪), তানহা (১৯৬৪), ১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন (১৯৬৬), বেহুলা (১৯৬৪), আগুন নিয়ে খেলা (১৯৬৭), অপরাজেয় (১৯৬৭), অভিশাপ (১৯৬৭), আলী বাবা (১৯৬৭), মোমের আলো (১৯৬৮), মায়ার সংসার (১৯৬৯), আদর্শ ছাপাখানা (১৯৭০), সূর্য ওঠার আগে (১৯৭০), মানুষ অমানুষ (১৯৭০), নতুন প্রভাত (১৯৭০), ওরা ১১ জন (১৯৭২), স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা (১৯৭৩), সূর্য কণ্যা (১৯৭৬), অশান্ত প্রেম (১৯৭৮), দাবী (১৯৭৮), অলংকার (১৯৭৮), মেহেরবাণু (১৯৭৮), ডুমুরের ফুল (১৯৭৮), নদের চাঁদ (১৯৭৯), ঘর সংসার (১৯৭৯), ছোট মা (১৯৭৯), ইশারা (১৯৭৯), নাগরদোলা (১৯৭৯), স্মৃতি তুমি বেদনা (১৯৮০), এতিম (১৯৮০), ভাই ভাই (১৯৮০), মাসুম (১৯৮১), দেনা পাওনা (১৯৮১), জন্ম থেকে জ্বলছি (১৯৮১), লাল সবুজের পালা (১৯৮১), অংশীদার (১৯৮১), দুই পয়সার আলতা (১৯৮২), দেবদাস (১৯৮২), নাত বৌ (১৯৮২), রেশমী চুড়ি (১৯৮২), মোহনা (১৯৮২), লাল কাজল (১৯৮২), আরশী নগর (১৯৮৩), দুই নয়ন (১৯৮৫), মিস লোলিটা (১৯৮৫), হাসি (১৯৮৭), সোনার হরিন, গাংচিল, আল্লাহ মেহেরবান, মাইলাভ, দরদী শত্রু, সাধনা, দেয়াল প্রভৃতি।

(২) অভিনয়ঃ মঞ্চ-বেতার ও টেলিভিশন

সুমিতা অনেক মঞ্চ, বেতার ও টিভি নাটকে অভিনয় করেছেন। শেষ জীবনে চিত্রজগতে অনাদর উপেক্ষার শিকার হয়ে অর্থনৈতিক কারণে মঞ্চ বেতার ও টিভি নাটকে অভিনয় করেন।

<u>৩)</u> চলচ্চিত্র প্রযোজনা

সুমিতা দেবী ১৯৬৬ সালে নিজের নামে 'মিতা ফিল্মস্' নামে একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ ব্যাপারে সহায়তা করেন তার স্বামী জহির রায়হান। জানামতে সুমিতা দেবীই হচ্ছেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মহিলা চিত্র প্রযোজক। এ প্রতিষ্ঠান থেকে জহির রায়হানের তত্ত্বাবধানে 'নীল দর্পন' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হবে বলে সংবাদ প্রবাদ প্রচারিত হয় । ৩ (চিত্রালী, ১৮ নভেম্বর ১৯৬৬)। পরিবর্তীকালে এ চলচ্চিত্রটি আর নির্মিত হয়নি।

মিতা ফিল্মস্ এর প্রযোজনায় প্রথম যে, চলচ্চিত্রটির কাজ শুরু হয় সেটির নাম 'আগুন নিয়ে খেলা' পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠান থেকে আরও কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।নিচে সুমিতা দেবী প্রযোজিত চলচ্চিত্রের বিবরণ দেয়া হলো ।

আগুন নিয়ে খেলা (১৯৬৬)

আগুন নিয়ে খেলা চলচ্চিত্রের শ্যুটিং শুরু হয় ১৯৬৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর। এফডিসির ১নং ফ্লোরে একটানা ৭ দিন এ ছবির শ্যুটিং চলে হয় বলে পত্রিকার খবরে উল্লেখ করা হয়। এছবির পরিচালক ও আমজাদ হোসেন ও নুরুল হক বাচ্চু, চিত্র নাট্য ও সংলাপ রচয়িতায় আমজাদ হোসেন, চিত্রগ্রাহক সাধন রায়, সংগীত পরিচালক আলতাফ মাহমুদ এবং এতে অভিনয় করেন সুমিতা, শওকত আকবর, ফতেহ লোহানী, সুজাতা, রাজ্জাক, রানী সরকার, আমজাদ, মাওলা, জাভেদ রহিম, মঞ্জুশ্রী, রহিমা প্রমুখ।৪১ । আগুন নিয়ে মুক্তি পায় ১৯৬৭ সালে।

আগুন নিয়ে খেলার মাধ্যমে বিশিষ্ট অভিনেতা, কাহিনীকার, নাট্যকার, আমজাদ হোসেন চিত্রপরিচালক হিসেবে আবির্ভূত হন। সেই সঙ্গে নুরুল হক বাচ্চুও এর মাধ্যমে পূর্নাঙ্গ পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তারা দুজনেই আগে জহির রায়হানের সঙ্গে কাজ করতেন। যাই হোক আগুন নিয়ে খেলা সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় লেখা হয় যে, এ ছবিটি নাকি ভারতীয় লেখক শৈলেষ দে-র লেখা 'বধূ'র নকল। ৪২

মোমের আলো ঃ(১৯৬৮)

মিতা ফিল্মস প্রযোজিত দ্বিতীয় চলচ্চিত্র 'মোমের আলো'। এটি পরিচালনা করেন মোস্তফা মেহমুদ, কাহিনী রচনা করেন-রোমেনা আফাজ, চিত্রগ্রহণ করেন- আব্দুল লতিফ বাচ্চু, সংগীত পরিচালনা করেন সত্য সাহা। এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন সুজাতা,

আনসার, সুমিতা, ফতেহ লোহানী, শওকত আকবর, সিরাজ, রাণী সরকার, মঞ্জুশ্রী, রওশন নবী, আশিষ, দিলীপ, রুবিনা, কল্লোল, বিপুল ও অনল।

সংক্ষেপে এ ছবির কাহিনী হচ্ছে জমিদার খান বাহাদুর মাহমুদ চৌধুরীর একমাত্র ছেলে জাফর চৌধুরী বিলেতে লেখাপড়া করতে গিয়ে পিতাকে না জানিয়ে সুফিয়া নামে এক নার্সকে বিয়ে করে। ওখানে তাদের এক পুত্র সন্তান জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় হাসান চৌধুরী। অন্যদিকে মাহমুদ চৌধুরীর ভাতিজা আসলাম চৌধুরীও বিলেতের লেখাপড়া শেষে স্ত্রী মরিয়ম ও শিশু কন্যা সুলতানাকে নিয়ে চাচার সংসারেই বসবাস করতে থাকে। মাহমুদ চৌধুরী যখন জানতে পারে তার পুত্র বিয়ে করেছে তখন সে এ বিয়ে মেনে নেয় না। জাফর চৌধুরী পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র হয়ে পড়ে অসহায়। এদিকে মাহমুদ চৌধুরী অসুখে পড়লে নার্স সুফিয়া নিজের পরিচয় গোপন করে শ্বশুরের চিকিৎসা করতে থাকে। তাই আসলাম চৌধুরী জানতে পেরে সুফিয়াকে তাড়িয়ে দেয়। এদিকে সুফিয়ার ছেলে হাসান লেখাপড়া শিখে ডাক্তার হয়। তার সঙ্গে পরিচয় ঘটে আসলাম চৌধুরী মেয়ে সুলতানার। অবশেষে এ পরিচয় থেকে প্রনয় ও পরিণয় ঘটে। এ ছবির সুফিয়া চরিত্রে অভিনয় করেন প্রযোজিকা সুমিতা দেবী। পত্রিকায় তার অভিনয়ের প্রশংসা করা হয়। পত্রিকায় আরও লেখা হয় "সামাজিক ছবি হিসেবে মোমের আলো আজকের দিনের রূপকথার বাজারে একটি ব্যতিক্রম। তাই এ ছবি দর্শকের কাছে প্রিয় হয়েছে।" ৪৩

অন্য একটি পত্রিকায় ছবি সম্পর্কে লেখা হয় ঃ

'আজ পর্যন্ত যতগুলো ভাল বাংলা ছবি এখানে মুক্তি পেয়েছে 'মোমের আলো' সেসবের মধ্যে অন্যতম নিঃসন্দেহে। কেননা সবদিক দিক দিয়ে না হলেও মানবিক আবেদনের দিক দিয়ে 'মোমের আলো' কে একটি পরিচ্ছন্ন ছবি বললে অত্যুক্তি হচ্ছে না। ...... এত এত 'ফোক মার্কা' ছবির ভিড়ে 'মোমের আলো' একটি আদর্শ সৃস্টি-একথা নিঃসন্দেহ।৪৪

মায়ার সংসার (১৯৬৯)

সুমিতা দেবী প্রযোজিত তৃতীয় চলচ্চিত্র 'মায়ার সংসার' এর কাজ শুরু হয় ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে। আর এটি মুক্তি পায় ১৯৬৯ সালের ২৪ অগাষ্ট। এছবির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেন মোস্তফা মেহমুদ, চিত্রগ্রহন করেন আব্দুল লতিফ বাচ্চু, সংগীত পরিচালনা করেন আনোয়ার উদ্দিন খান, ও সম্পাদনা করেন- ইসরাইল মন্টু। আর এতে অভিনয় করেন সরকার কবীর উদ্দিন, সুজাতা, ফতেহ লোহানী, সুমিতা, আনসার, রুবিনা, শওকত আকবর, রাণী সরকার, সিরাজ, মিঠু প্রমুখ। এ ছবির মাধ্যমে মঞ্চ ও টিভি অভিনেতা আনসার প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন।

আদর্শ ছাপাখানা (১৯৭০)

সুমিতার মিতা ফিল্মস প্রযোজিত ৪র্থ ছবি আদর্শ ছাপাখানা মুক্তি পায় ১৯৭০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। এটি পরিচালনা করেন মোস্ত ফা মেহমুদ। এ ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে আবদুস সাত্তার রচিত হাসির নাটক 'বিদ্যালংকার প্রেস' অবলম্বনে। এ ছবির সংগীত পরিচালনা করেন আলতাফ মাহমুদ। এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন সুজাতা, জলিল, সুমিতা, রাণী সরকার, সুলতানা, আশিষ কুমার লৌহ, হাসমত, খান জয়নুল প্রমুখ।

এ ছবির বিজ্ঞাপনে লেখা হয় 'বাঙ্গালী হাসতে জানে না-জানে শুধু কাঁদতে-এ প্রবাদ মিথ্যে।

আদর্শ ছাপাখানা এর প্রমাণ'। ৪৫

এ ছবির সমালোচনার প্রসংগে লেখা হয়ঃ

'এটি একটি নিছক হাসির ছবি। অভিনয়ও করেছেন এখানকার প্রায় সমস্ত কৌতুক অভিনেতাই। সাত্তারের মূল নাটক দর্শক কর্তৃক যেমন সমাদৃত হয়েছিল, ছবি হওয়ার পর তেমনটির অনুপস্থিতিতে দর্শককূল স্বভাবত পরিচালককে দোষারোপ করেছিল তার অযোগ্য পরিচালনার জন্য'।৪৬

নতুন প্রভাত (১৯৭০)

সুমিতা প্রযোজিত পঞ্চম চলচ্চিত্র 'নতুন প্রভাত' মুক্তিপায় ১৯৭০ সালের ২৩ অক্টোবর। ছবি নির্মাণের আগে দুজন নতুন নায়ক নায়িকাকে সুযোগ দেওয়া হবে বলে সুমিতা দেবী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সেই বিজ্ঞাপন অনুসারে ছবিতে একজন নুতন নায়িকা

নেওয়া হয়। রত্মা নামের একজন মঞ্চাভেনেত্রীকে এ ছবির নায়িকা চরিত্রে নির্বাচন করা হয়। ছবিতে কাহিনীতে বর্ণিত নায়িকার নামানুসারে এ নবাগত অভিনেত্রীর নাম রাখা হয় নুতন। তবে ছবিতে চরিত্রটির নাম ছিল নতুন আর নায়কের নাম ছিল প্রভাত। এদের নামেই ছবির নামকরণ করা হয় 'নতুন প্রভাত'। ৪৭

নতুন প্রভাত পরিচালনা করেন মোস্তফা মেহমুদ। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেন আশিষ কুমার লোহ, চিত্রগ্রহণ করেন আব্দুল লতিফ বাচ্চু, এবং সংগীত পরিচালনা করেন সত্য সাহা। এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন ঃ নবাগত নুতন, প্রভাত (আনসার), সুমিতা, আনোয়ার হোসেন, ফতেহ লোহানী, সবিতা, জরিনা, হাসমত, রাণী সরকার, আশিষ, দিলীপ, সিরাজ, কল্লোল ও বিপুল। এ ছবির বিজ্ঞাপনে লেখা হয়

'অবিস্মরণীয় বাংলা সামাজিক নাটক। রূপালী পর্দায় অমর কথাচিত্র। জনপ্রিয় সংগীত, বলিষ্ট কাহিনী। রোমাঞ্চ ও আলোড়নসৃষ্টিকারী সংগীতপূর্ণ চিত্র'।৪৮

এ প্রসংগে এ ছবির নায়িকা নুতন সম্পর্কে লিখেন সুমিতা দেবী ঃ

'মিতা জহিরের দেয়া আমার ছদ্ম নাম ছিল। এই নামেই জহির আমাকে ডাকতো। যা হোক, মিতা ফিল্মস থেকে আমি আগুন নিয়ে খেলা, মোমের আলো, মায়ার সংসার, আদর্শ ছাপাখানা, নতুন প্রভাত নামের এই পাঁচটি ছবি নির্মাণ করেছিলাম। শুধু তাই নয়, নতুন প্রভাত ছবির মাধ্যমে আমি এক জোড়া নতুন মুখ উপহার দিয়েছিলাম। যার মধ্যে নায়িকা নতন একজন। নতনকে ছবিতে নিতে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। সালটা ঠিক মনে নেই। আমি তখন অপপিচিতা ছবির নায়িকা ছিলাম। ঐ সময় মিতা ফিল্মস পঞ্চম ছবির জন্য একজোড়া নতুন মুখ খোঁজছিলাম। তো একদিন আমি এফডিসিতে অপরিচিতা ছবির শুটিং করছিলাম। বড় দু'বোনের সঙ্গে নতন তখন ঐ স্পটে আসে। নতন এর বড় বোন নাচতো। আর মেঝো বোন ও নাচতো। তখন ওর (নতনের) নাম ছিল রত্না। রত্না ওদের সঙ্গে শঠিং দেখতে এফডিসিতে আসে। তখন রত্নার বয়স ১৫ কি ১৬ বছর হবে। দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। ওকে দেখে আমার পছন্দ হল। আমি ওর বড় বোনকে বললাম রত্না আর একটু বড় হলে আমার কাছে নিয়ে এসো, ওকে নায়িকা বানাবো। এ ঘটনার কয়েক দিনের পর ওরা রত্নাকে নিয়ে এলো। আমি তো অবাক। পরে আমি রত্নাকে স্ক্রিন টেষ্টের জন্য এফডিসিতে নিয়ে গেলাম। তখন রত্না ছিল খুব শুকনা। তখন পরিচিত অনেকে রত্নাকে দেখিয়ে আমাকে বিদ্রুপের সঙ্গে বলল -এই শুকনা মেয়েকে নায়িকা বানালে ছবি কে দেখবে? আমি তাদেরকে বলেছিলাম এই মেয়েকেই আমি নায়িকা বানাবো এবং ছবিও হিট করবে। তখন সত্যি এটা ছিল আমার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। আমি রত্নাকে বাসায় নিয়ে এলাম। আমি শুনেছিলাম বিয়ার খেলে নাকি মানুষ মোটা হয়। যেই চিন্তা সেই কাজ। আমি প্রতিদিন রত্নাকে একটা করে বিয়ার খাওয়াতে লাগলাম। এভাবে একমাস। এক মাসে রত্না বেশ মোটাতাজা হয়েছে। আমি ওকে নিয়ে এফডিসিতে গেলাম। সবাইতো রত্নাকে দেখে অবাক। শুকনা মেয়েটি তো এখন বেশ স্বাস্থ্যবতী! সুন্দরীও হয়েছে আগের চেয়ে অনেক। এখন নায়িকা বানানো যায়। সবাই আমার কাছে জানতে চাইল কি খাইয়ে ওকে মোটা করেছি। আমি বললাম, যাদু দিয়ে। প্রতিদিন সকাল বিকাল রত্নাকে ঝাড়ফুঁক দিতাম, এতেই রত্না মোটা হয়ে গেছে। রত্নাকেও আমি জানিয়েদিয়েছিলাম বিয়ারের কথা কাউকে বলবে না, ঝাড়ফুঁকের কথা বলবে। বিয়ারের কথা বললে ওরা তোমাকে আরো বিয়ার খাইয়ে বেশি মুটিয়ে ফেলবে। তখন তোমাকে কেউ নায়িকা বানাবে না। বেশি হবার ভয়ে রত্না তাই কাউকে কিছু আর বলেনি।

*তখন আমি রত্নার নাম বদলে রাখলাম নতন। এ নামেই এখন সে পরিচিত। এ ছাড়া ঐ ছবিতে বিরু নামের একটি ছেলেকে নিলাম। ওর নাম রাখলাম প্রভাত। দুই নাম দিয়েই আমি ছবির নাম ঠিক রকলাম 'নুতন প্রভাত'। এ নামেই ছবিটি হিট হয়। কিন্তু নায়ক হিসেবে বিরু অর্থাৎ প্রভাত থাকে না। মানিকগঞ্জে যখন এ ছবির শটিং করতে যাই। বিরুর ডিগ্রী পরীক্ষা খুব কাছে, একথা বিরুর বাবা আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে ছিল। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ওকে বাদ দেই। পরে আমি আনসার নামে একটি ছেলেকে দিয়ে ছবিটি করি। আমার সেই সৃষ্টি নায়িকা নতন আজ বেশ পরিচিত। নতন প্রতিষ্ঠিত নায়িকা হবার পর আমাকে আর মনে রাখেনি। এজন্য আমার কোন দুঃখ নেই। আমি সৃষ্টির আনন্দেই নতনকে ছবির জগতে এনেছিলাম।'*৪৯

(৪) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণঃ

শিল্পীদের মন হতে হয় কাঁদার মতো নরম। তাও আবার নারী শিল্পী। কিন্তু এ নারী শিল্পীই যখন দেখেন যে, তার সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি হায়েনারা আক্রমন করে তখন তিনি হয়ে ওঠেন প্রতিবাদী একজন। সুমিতা দেবী অভিনয় করে যেমন রূপালী পর্দার জগতে নিজের আসনটিকে পাকা করে নিয়েছিলেন ঠিক তেমনি নিজ মাতৃভুমিকে রক্ষার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কালে তিনি কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এ প্রসংগে লিখেছেন ঃ

'১৯৭১ সাল। সারা বাংলাদেশ রাজনৈতিক বিক্ষোভে টাল-মাটাল। এই বিক্ষোভ একদিন জাতীয় স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়। রূপ নেয় সশস্ লড়াইয়ের, সশস্ প্রতিরোধের। পাকিস্নী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে মাতৃভূমিকে মুক্ত, স্বাধীন করার মরণপণ শপথ নেয় প্রতিটি বাঙালী। আমিও তাতে শরীক হই। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আমার শৈল্পিক সত্তাকে প্রাণপণ নিয়োজিত করি। ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশের সমস্ শিল্পীদের সঙ্গে মিলেমিশে নাটক করি। নাটক করে অর্থ সংগ্রহ করি। কোলকাতা, কানপুর-আরো অনেক জায়গা থেকে। কষ্টকে তখন কষ্ট বলে মনে হয়নি। নাটক থেকে নাটক থেকে সংগৃহীত অর্থ আমরা, শিল্পীরা মুক্তিযোদ্ধাদের ফাণ্ডে জমা দিই।

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটি স্মৃতি আমাকে এখনো আনন্দে উদ্বেল করে তোলে। গর্বে বুক ফুলে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে কত মানুষ মারা গেছে। কত বোন তার ভাইকে হারিয়েছে। কত ভাই হারিয়েছে তার বোনকে। কত জন আহত-নিহত হয়েছে। কি বিপুল রক্তে সবুজ ঘাষ আর্দ্র হয়েছে-তার হিসেব নেই। লেখাজোখা নেই। আর ওই রক্তের ধারাস্রোতে আমারও কয়েকফোঁটা রক্ত মিশে আছে। মাতৃভুমি তাইতো মুক্ত হয়েছে। এ আমার গর্ব। এ আমার বুকভরা গর্ব যে, এক আহত, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধার দেহে রক্তের প্রয়োজনে আমি তাকে আমার নিজের দেহের রক্ত দিয়ে তাকে বাঁচতে, সেরে উঠতে সাহায্য করেছিলাম। সে বেঁচে উঠেছিল। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সে আহত হয়েছিল, আমার রক্ত পেয়ে সে বেঁচে উঠে সে আবার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করেছিল। সেই আহত মুক্তিযোদ্ধার 'এ' গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন পড়েছিল। কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। আমার তখন মনে পড়েছে যে, বাবার মৃত্যু শয্যায় আমাকে রক্ত দিতে হয়েছিল। আমার আর আমার বাবার রক্তের গ্রুপ ছিল 'এ'।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেই বীর মুক্তিযোদ্ধা দেশে ফিরে এসেছিল। প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করে যেতো। দু'তিন বছর সময় পেলেই সে আসত। কিন্তু বছর দশেক যাবৎ তার দেখা নেই। আজ সে কোথায়? তাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে।'[৫০]

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য

সুমিতা ছিলেন খুবই আবেগ প্রবন মানুষ। তিনি ছিলেন রাজনীতি ও সমাজ সচেতন। তার দু স্বামীই জড়িত ছিলেন রাজনীতির সংগে। স্বামীদের সঙ্গে তিনি রাজনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রসংগে সহায়তা করতেন ও অভিন্ন মত পোষণ করতেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং মুক্তিযুদ্ধে সুমিতার অংশগ্রহণের কথা সুবিদিত। আর্তমানবতার সেবায় তিনি সব সময় এগিয়ে এসেছেন। ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরনে বা অসুস্থ শিল্পীদের সাহাযার্থে এবং সহশিল্পীদের সাহাযার্থে তিনি সব সময়ই অন্যান্যের সঙ্গে এগিয়ে আসতেন। যেমন ১৯৭৬ সালের ১৫ জানুয়ারি বিশিষ্ট অভিনেতা আনোয়ার হোসেন কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এ অনুষ্ঠানে চিত্রকর্মীদের পক্ষ থেকে প্রবীণ অভিনেত্রী রহিমা খাতুন ও সুমিতা তাকে মালা দেন। ১৮ জানুয়ারি রাজ্জাককে দেয়া হয় অনুরূপ সম্বর্ধনা। এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সুমিতা দেবীও বক্তব্য রাখেন।[৫১] (ঝিনুক, জানুয়ারী ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪, পৃ-৪৩)।

সুমিতা দেবী সব সময় ভাষা শহীদ, মুক্তিযোদ্ধা এবং সহকর্মীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা দেখাতেন। যেমন, ১৯৭৫ সালের মহান শহীদ দিবস উপলক্ষে এফডিসির কলাকুশলীরা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তারকাশূন্য এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এক কালের জনপ্রিয় তারকা সুমিতা দেবী। এ অনুষ্ঠানের শুরুতে সুমিতার প্রস্তাবে চিত্রাভিনেত্রী লাবণীর মৃত্যুতে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় (ঝিনুক, শহীদ দিবস সংখ্যা পৃঃ ৪৭)।

অভিনয় জীবন থেকে সাংসারিক জীবন তার নিকট কাম্য ছিল বলে তিনি একবার বলেছিলেন। তার মধ্যে মাতৃত্বের বিষয়টিও বড় হয়ে দেখা দিত। তিনি বলতেন ' আমি মা ! নারীর যে শাশ্বত মাতৃত্ব তার মাঝেই আমি বাঁচতে চাই! সে পরিচয়েই আমাকে বাঁচতে হবে।' (আনোয়ার আহমেদ সম্পাদিত এ্যালবাম, ১৯৬৮, পৃ-১০০)।

তিনি অতীতের কথা ভেবে প্রায়ই নষ্টালজিয়ায় ভুগতেন।

'তিনি বলতেন কতদিন হয়ে গেল ? অনেক অনেক বছর তাই না? মনে পড়ে মানিকগঞ্জের সেই সোনাঝড়া দিনগুলোর কথা। ফিরে যেতে ইচ্ছে করে মানিকগঞ্জের সেই সোনালী দিনগুলোতে। কিন্তু একবার যা হারিয়েছি তা কি কখনও ফিরে পাব? কোথায় গেল সেই হেনা ভট্টচার্জি! হেনা ভট্টচার্জি কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিল তার মাঝে লুকিয়ে আছে এক শিল্পী সত্তা। যার প্রকাশ হবে হেনার মাঝে নয়, সুমিতার মাঝে। (প্রাগুপ্ত পৃষ্ঠা-১০১-১০২)

জীবন বোধ ও শিল্প দৃষ্টি

শেষ জীবন ও মৃত্যু ঃ
সুমিতা বাংলাদেশের চিত্র জগতের ফাষ্ট লেডী, গ্ল্যামার কন্যা, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, সুমিতা দেবী একসময় ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিস্কের প্রভা নিয়ে দেদিপ্যমান। কিন্তু বয়সের কারণে এবং চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। একসময় যারা এই অভিনেত্রীর অভিনয় প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হতেন পরিচালকরা তাঁকে ব্যবহার করতেন নিশ্চিত বানিজ্যের উপাদান হিসেবে। সেই সুমিতার দেবীর শেষ জীবন কষ্টকর, বেকারত্বে ভরপুর। তিনি অভিনয় জগতে শেষ জীবনে চরম অবহেলার স্বীকার হন। অনেকেই তাঁকে অভিনয়ে সুযোগ দিতেন না। অন্যদিকে অশ্লীলতা ও সহিংশতায় পরিপুর্ণ চিত্রজগতের বেহাল অবস্থা দেখে এক কালের ফাষ্টলেডী সুমিতা দেবীর মনেও জন্মেছিল চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ। এর বহিপ্রকাশ ঘটতো মাঝে মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সাক্ষাৎকার ও বিবৃতিতে। তিনি মৃত্যুবরন করেন ২০০৪ সালের ৬ জানুয়ারি। আর ২০০৩ সালের ২৮ অগাষ্ট দৈনিক জনকণ্ঠের পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন 'এফডিসিতে আমার লাশ যাক এটা আমি চাই না'। উক্ত সাক্ষাৎকারের পুরো বিবরণটি নিম্নে তুলে ধরা হলো

'সময়টা ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে স্পষ্ট চোখে ভাসছে, বিজি প্রেসে পাশের রাস্তায় সেট বানিয়ে এফডিসি প্রথম চলচ্চিত্র আসিয়া শূটিং। আমি ছিলাম সেই ছবির নায়িকা। অবশ্য ছবিটি তখন মুক্তি পায়নি। এফডিসির প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি আকাশ আর মাটি। পরিচালক ফতেহ লোহানী। সেই ছবিতেও নায়িকা ছিলাম আমি। এরপর আর যাত্রা থামেনি। একটানা অভিনয করেছি। এখনও মরিনি। যাঁরা বুড়ো হয়েছি তাঁদের অনেকেই বেঁচে আছেন। এটা সবাই জানে। কিন্তু কেউ আসে না। অভিনয়ের জন্য কেউ ডাকে না। আমরা কি নিজ থেকে কাজ চাইতে যাব তাঁদের কাছে? অন্তত আমি তা পারবনা-ক্ষোভ মিশ্রিত এ কথাগুলো এক দমে বলেই কেঁদে ফেললেন এক সময়ের সাড়া জাগানো অভিনেত্রী সুমিতা দেবী। দীর্ঘদিন তিনি অভিনয় জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। শেষ ছবি 'বিদ্রোহী সিপাহী' কয়েক বছর আগে মুক্তি পেয়েছে। চলচ্চিত্রে অভিনয় থেকে এরপর একেবারেই দূরে সরে আছেন। কেন? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্যই আমরা গিয়েছিলাম সুমিতা দেবীর বাসায়। সুমিতা দেবী বললেন, অভিনয় আমার জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। তাই অভিনয় করতে করতেই যদি

আমার জীবন চলে যায় তাহলে আমি সবচেয়ে বেশী খুশি হব। কিন্তু এখন মা, দাদি, নানি এসব চরিত্রে অল্প বয়স্ক মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করানো হয়। মেকআপ ও চুল পাকিয়ে তাদের উপস্থাপন করা হলেও কণ্ঠস্বর তো পরিবর্তন করা যায় না। বললেন, আমাদের বাঙালী সংস্কৃতিটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এদেশের পরিচয় বাঙালী সংস্কৃতি দিয়ে। অথচ এই পরিচয়টা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। অশ্লীলতা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, পরিবার-পরিজন নিয়ে এখন আর ছবি দেখা যায় না। সত্যিকার অর্থে জহির রায়হান চলচ্চিত্র জগত থেকে হারিয়ে যাওয়ার পর এই শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে তা আর পূরণ করা যায়নি। তিনি আর কিছুদিন বেঁচে থাকলেও আজ এফডিসিতে এত বড় ধস নামত না। প্রথম ছবি 'আসিয়া' তেও দেশীয় সংস্কৃতির সবকিছু ছিল। পুতুল নাচ, সাপ খেলা, নৌকা বাইচ, মেলা-এসব আর এখনকার ছবিতে দেখা যায় না। কই, পাকিস্তান তো তাদের সংস্কৃতি বিসর্জন দেয়নি। তবে আমরা কেন দিলাম? সুমিতা দেবী বললেন, আমি এক সময় বলেছিলাম এফডিসিতে যেন আমাকে কবর দেয়া হয়।যুগ যুগ ধরে যেন শিল্পীরা ঐ কবর দেখে আমাকে মনে করে। কিন্তু এখন আমার এ ইচ্ছা নেই। চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থায় এফডিসিতে আমার লাশ যাক, এটা আমি চাই না। লোক দেখানো প্রেম-ভালবাসা আমার আর প্রয়োজন নেই।

আপনার স্বপ্ন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, হয় আমাদের হারিয়ে সংস্কৃতি ফিরে আসবে না হয় এফডিসির সব ভবন শুকনা মরিচের গোডাউন হবে। এটা দেখেই মরতে চাই। এই আমার স্বপ্ন, চলচ্চিত্রের বর্তমান সংকট কিভাবে দূর করা সম্ভব? এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রজন্মের সুস্থ রুচির কিছু ছেলে মেয়ে জোট বেঁধে নামলেও পরিবর্তন আসতে পারে । এ জন্য প্রয়োজন সংস্কৃতি অঙ্গনের সঙ্গে একটা যুদ্ধ। '৭১-এর মতো আরেকটা যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যারা জয়ী হবে তারাই ছবিতে কাজ করবে। সরকারী অনুদানের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভাল ছবি তৈরীর জন্য প্রতিটি সরকারই অনুদান দেয়। কিন্তু অনুদানের টাকা দিয়ে কী ধরণের ছবি তৈরী হচ্ছে সেটা আর সরকার তদারক করে না।

সুমিতা দেবী এ পর্যন্ত প্রায় ২'শ ছবিতে অভিনয় করেছেন। সুমিতা দেবী বলেন, তাঁদের প্রযোজনা সংস্থা মিতা ফিল্মস থেকে এ পর্যন্ত পাঁচটি ছবি মুক্তি পেয়েছে। এগুলো হচ্ছে 'আগুন নিয়ে খেলা', 'মোমের আলো. মায়ার সংসার, আদর্শ ছাপাখানা ও নতুন প্রভাত।

তিনি বলেন, জহির রায়হানের অসমাপ্ত একটি গান দুটি সুরে'র কাজ শুরু করার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। কিন্তু আর্থিক সঙ্গটের কারনে পারছেন না। বললেন ছবিটির কাহিনী এতটাই আকর্ষণীয় যে, হলে প্রদর্শিত হলে এ দেশে আর কখনোও নকল ছবি তৈরি হবে না। একটি গান' দুটি সুরে জহির রায়হানের শেষ লেখা। তিনি এ ছবির করিয়ে গানগুলোও নিজে লিখেছেন। মালেক মনসুরকে দিয়ে সুর করিয়েছিলেন। কিন্ত ছবির কাজ শুরু করতে পারেননি '।

সমকালীন প্রতিক্রিয়া

পরিশিষ্ট : ইতিহাসের সংলাপেআমি : সুমিতা দেবী

‘প্রদীপ নিবে গেলে তার শিখা কোথায় যায়। সেও মিলিয়ে যায় হারানো সুরের গান গেয়ে। প্রদীপ আর শিখা, আলো আর বাতাস। এরা সবাই অচেতন। জীবন এদের নিস্পন্দন তাই প্রয়োজন হয় না এদেরকে জানাবার । কিন্তু মানুষ সচেতন। জন্ম আছে। আছে মৃত্যু । তাই রচিত হয় ইতিহাস’। সেই ইতিহাসই আজ লিখতে বসবো। কার ইতিহাস লিখবো,. তা জানিনা। তার চেয়ে বরং একট গল্প লিখি।

সে এক মজার গল্প। সে গল্পের আখ্যান ভাগে একটি মেয়ে -আর তাকে নিয়ে চ-জানা-শোনা অনেক কয়েকটা মুখ।

একটি গ্রাম। নাম খোললি। ধলেশ্দু’ক বেয়ে উপচে পড়ে ঢেউ। আছাড় খায়। মানুষ তা দেখে আনন্দ পায় ।মানুষের সেই আনন্দ দেখে আরেকটি মেয়ে খিল খিল করে হেসে ওঠে।

এই হাসির শব্দে উদার স্নেহমাখা গ্রামের সবুজ প্রকৃতি আর খেলার মাঠ একটি বারের জন্যে চমকে উঠে।

এদের চমক দেখে মেয়েটি আরো হেসে উঠে । বলে কি, কি দেখছ অমন করে? জানো না আমি তোমার স্নেহ ন্যে লালিত হেনা।

এই উছলে পড়া মেয়েটির হাসি একদিন স্তব্ধ হয়ে গেল। তার দুটি চোখ দিয়ে একবারের মতো একবারের মতো পরখ করে নিল সমগ্র পৃথিবীটাকে। চোখের দৃষ্টিতে দেখতে পেলো মহাকলঙ্কের এক মর্মান্তিক ইতিহাস।

দেখলো চারদিকে বুভুক্ষ মানুষের ক্ষুধার আর্তনাদ। শুধু মৃত্যু-শুধু মৃত-দেহ আর মরণের সে এক মহাতাণ্ডব লীলা। যুদ্ধবাজ মানুষের মানুসের পাপের প্রায়চিত্ত করলো কোটি কোটি নিরাপদ মানুষ্ ।

ক্ষুধার জ্বালায় মনুষত্বকে বিকিয়ে দিয়ে-বিবেককে বিকিয়ে দিয়েছে অসংখ্য মানুষ।সেই বিবেক আর ওপর দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের এক বিকট বিকৃত রূপ দেখেছে এই মেয়েটি। ১৩৫০ সালের অনেক ঘটনার স্বাক্ষী হয়ে রইল এই মেয়ে। এই দৃশ্য দেখে মেয়েটির জীবনে এলো তীক্ষ গ্ল্যানি আর জীবন সম্পর্কে হতাশা। এই হতাশাভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখেছে সংসারের মহাপ্রলয়ের আঁচ। গ্ল্যমার মেয় ।গ্রামের মেয়ে, খড়েরর চালে আগুনের শোভা দেখেছে, আর দাঁড়িছে দাঁড়িয়ে দেখেছে সেই আগুনের হিংস্র শিখা।

সেই হিংস্র শিখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে মানুষের মানুষের অভ্যন্তরে নরক আর স্বর্গ দু’ইয়ের অবস্থান।

**সেই নরগ আর স্বর্গের মাঝে সেই মেয়েটি চাইলো সুন্দরভাবে বেঁচে উঠতে। চাইলো স্রষ্টা হতে, চাইলো শিল্পী হতে।
কারণ, শিল্পী সমাজের সবচাইতে সেরা সচেতন মানুষ। সমাজের চাওয়া-পাওয়া , ব্যক্তিবর্গের আশা-নিরাশাও সুখঃ; দুঃখের নানা অনুভুতি শিল্পীর শিল্পকলার মধ্য আত্মপ্রকাশ করে। শিল্পের জগৎ আকাশের মত অসীম ব্যাপ্তির মাঝে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অদম্য স্পৃহা দেখা দিল মেয়েটির। সে চাইলো মানুষের হাসি-কান্নাকে রূপ দেবে নিজে-সে হবে অভিনেত্রী।**

তারপর। এলো সে সুযোগ। ১৯৫৭ সনে ‘আসিয়া’র সেলুলয়েডের ফিতায় সবাই দেখলো এই মেয়েটির মুখ।

তারপর সবাই তাকে দেখেছে। সবাই তাকে চিনেছে। যাকে মানুষ চেনে, তাকে সবার মাঝে চেনানোর জন্যে কোন উৎসব করতে হয় না। কারণ এ মেয়েটিকে কখনও দেখেছে চঞ্চলা, কখনও-বা বাগানের প্রজাপতির মত ডানা মেলে চলতে, কখনও-বা গ্রাম বাংলার বধবেশে । দেখেছি সবাই ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীমায়। কিন্তু সে একটি চরিত্র-একটি মেয়ে।

এই মেয়েকে মানুষ কখনও কাঁদতে দেখেছে, কখনও দেখেছে হাসতে। সে যে একটা চরিত্র। কখনও বা স্নেহ-প্রসাদ ভিক্ষুনী হয়ে হাত পেতেছে মানুষের কাছে।

ভালবাসা মানুষকে দগ্ধ করে, এনে দেয় চরম মুহুর্ত। তারও জীবনে এসেছে চরম মুহুর্ত। সেই মুহুর্ত ক'টার ওপর কারা যেন কুয়াশার জাল টেনে দিয়েছে।

সেই কুয়াশার জাল ছিন্ন হয়েছে। চারদিকের সব দৃশ্যপট বদলে গিয়ে আবার নুতন দৃশ্যপটের আবির্ভাব হয়েছে।

কখনওবা বাস্তবের রূঢ় রূপের নির্মল ছায়া পড়েছে তার জীবনের ওপর। বুকের গভীরতায় কান্নার ঢেউ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। মন তার গুমরে গুমরে কেঁদে উঠেছে। আবার দেবল-ত্রাস কালা পাহাড়ের ন্যায় সংকল্প নিয়ে আবার অভিযান শুরু করেছে। ভেঙ্গে পড়েনি।

ভেঙ্গে সে পড়তে পাড়ে না। সে জয়ী হয়েছে। ভালবেসেছে। বিয়ে করেছে এক স্রষ্টাকে। যে স্রষ্টা নিত্যনতুন প্রেরণায় আর বিবেকের তাড়নায় সৃষ্টির নেশায় ছুটে চলেছে। একজন স্রষ্টা আর একজন রূপকার। এই দু'য়ে জন্ম নিয়েছে কয়েকটি নিস্পাপ শুভ্র প্রাণ।

সেই মেয়েটি আজও এক অতিক্রান্ত বন্দরের দিকে অসহ্য অতৃপ্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে। কারণ, সে আনন্দ পায়নি। অথবা জীবনে সে কিসে বেশী আনন্দ পেয়েছে-এ বড় শক্ত প্রশ্ন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে যে একটা জীবন, সে জীবনের ওপর কতভাবে কত আনন্দের আলো ফুটলো, কত দুঃখের ছায়পাত হলো-তার ওপর যদি নম্বর বসিয়ে হিসেব করা হাতে, তবে হয়তো একটা সহজ উত্তর দেয়া যেতো। কিন্তু তা তো হবার নয়। শুধু তার উত্তরে সহজ উত্তর দেয়া যেতো। কিন্তু তা তো হবার নয়। শুধু তার উত্তরে বলা যায়, সে একটা মানুষ। অস্থি-মাংস-হেমোগ্লোবিন,হোয়াইট ব্লাড কার্পাসকেল, সেল-এদিয়ে গড়া একটি মর্তি। একটি নারী মর্তি।

আমিও তো একটি মানুষ। তার ওপর একটি নারী। নারী হয়ে আজ সেই হেনা নাম্নী নারীর সাথে নিজের চেতনার সাথে নিঃশেষে মিশিয়ে দিয়ে তাকে অনুভব করলাম। অনুভবের দর্পনে হেনার পাশে আর একটি মেয়ের ছবি ভেসে উঠেছে-সে যে আমি । আমি সুমিতা রায়হান। কবে ঐ হেনা নারী মেয়েটির সাথে আমার দেখা হয়েছিল, আমি এখনো সময় তারিখ বলে দিতে পারি। চোখ বন্ধ করে ওখানে আমি ফিরে যেতে পারি। জীবনের রোরুদ্দ্যমান বাসনাকে চরিতার্থ করতে পারি আমি। আমি শুধু যেতে পারি না ওখানে।

আর ফিরে যেতে চাইনা ওখানে। কারণ, অনন্ত নীল আকাশ, রূপালী চাঁদ আর কুসুমের সমারোহ -সেটাই একমাত্র সত্য নয়। আকাশে মেঘ আছে, চাঁদে আছে কলঙ্ক , কীট আসে কুসুমে। স্নেহ -মায়া-মমতা যতটুকু আছে তার চেয়ে বেশী আছে লোভ-লালসা, জঘন্যতা, হিংসা।

ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য

সুমিতার জীবন ছিল কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর। বিশেষ করে চিত্রজগতে জড়িত হওয়ার পর। ১৯৫৭ সালে এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর তিনি 'আসিয়া' চলচ্চিত্রের নায়িকা হন সেই থেকে অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি চিত্রজগত, বেতার, মঞ্চ, টেলিভিশন, মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য সামাজিক কর্মের সংগে জড়িত ছিলেন। এ কর্মসূত্রে বিভিন্ন স্তরে তিনি বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এছাড়া বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব জহির রায়হানের স্ত্রী হিসেবেও তিনি সবার কাছে পেয়েছিলেন একটি আলাদা মর্যাদা।

তিনি সান্নিধ্য পেয়েছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার অভিনেতা ফতেহ লোহানী, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ও ষ্টুডিও নির্মাতা নাজীর আহমদ, পরিচালক আব্দুল জাব্বার খান, 'জাগো হুয়া সাভেরা' খ্যাত পরিচালক এজে কারদার, ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলাম, পরিচালক হায়দার শফী, অভিনেতা কাজী খালেক, রওনেন কুশারী, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব খান আতাউর রহমান, অভিনেতা পরিচালক সুভাষ দত্ত, চিত্রগ্রাহক সাধন রায়, আফজাল চৌধুরী, কিউ এম জামান, রফিকুল বারী চৌধুরী, পরিচালক এহতেশাম, সালাহউদ্দিন, জিল্লুর রহিম, মোস্তফা মেহমুদ, আমজাদ হোসেন,

অভিনেতা আনোয়ার হোসেন, রহমান, শওকত আকবর, অভিনেত্রী রওশন আরা, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, বেবী জামান, সুলতানা জামান, রহিমা খাতুন, পূর্ণিমা সেনগুপ্তা, পরিচালক নারায়ন ঘোষ মিতা, পরিচালক সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ আউয়াল, অভিনেত্রী আনোয়ারা, প্রয়াত অভিনেতা সোনা মিয়া, পাকিস্তানের এজাজ, সাবিহা সন্তোষ, নিলু, নুসারাত, মেকাপম্যান চিত্ত দা (চিত্ত বর্ধন), শ্যামদা, সুরকার সুবল দাস, ডিষ্ট্রিবিউটর মোশাররফ হোসেন, আকস মামা (ক্যামেরা ম্যান) প্রমুখের। এদের সান্নিধ্যে সুমিতার জীবন সৃজনশীল আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল।

খান আতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সুমিতা দেবী লিখেছিলেন ঃ

খান আতা মরণোত্তর স্বীকৃতি হয়তো পাবেন, কিন্তু জীবদ্দশায় তিনি তাঁর মূল্যায়নের সামান্যটুকুও চোখে দেখে যেতে পারলেন না, এরচেয়ে বড় দুঃখের ব্যাপার আর কি হতে পারে। খান আতা বেঁচে থাকবেন, তাঁর গানের মধ্যে, তাঁর সুরে, তাঁর গানের বাণীতে যে মাধুর্য তা কোনদিন হারিয়ে যাবে না। খান আতা পরিচালিত কোন ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ না পেলেও নায়ক খান আতার নায়িকা ছিলাম আমি। অভিনেতা খান আতা যে কত বড় মাপের তার সহশিল্পী হয়ে আমি উপলব্ধি করেছি।

খান আতা আমার ভাল বন্ধু ছিলেন। বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলে এত অল্প পরিসর দূরে থাক, চিত্রালীর এক সংখ্যাতেও কুলোবে না। সবচে এখন দুঃথ লাগছে, কিছু দৈনিক পত্রিকা খান আতা সম্পর্কে কিছু ভুল তথ্য লিখেছে। আমার সাথে কথা না বলে আমার জবানীতে বিভ্রান্তিকর খবর লিখেছে। শুধু তাই নয় এই জেনারেশনের এমন কিছু

সুমিতা ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে ফতেহ লোহানী, নাজীর আহমদ, খান আতাউর রহমান এবং জহির রায়হানের কথা প্রায়ই বলতেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন কথায় এদের কথা উল্লেখ রয়েছে।

মৃত্যুর পর্বের ভাবনাগুলি ঃ

বেশ কয়েক বছর আগে আমি স্থানীয় একটি পত্রিকার মাধ্যমে আমার শেষ প্রার্থণার কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম-আমার মৃত্যু হলে আমাকে যেন অবহেলা ভরে হলেও কবর দেয়া হয় এফডিসির চত্বরে, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল আমার অভিনয় জীবন। নায়িকার জীবন। আমি এই আবেদনটা জানিয়েছিলাম এজন্য যে, আমি একদিন এই পৃথিবীতে থাকবনা। পরপারে চলে যাব। তখন এফডিসিতে যারা কাজ করবে, তারা হয়তো আমার কবরটি দেখিয়ে বলবে, এই সেই সুমিতা দেবীর কবর, যাকে নায়িকা করে প্রথম পর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি তৈরী হয়েছিল। আমি বেঁচে না থাকলেও তখন যারা এফডিসিতে কাজ কাজ করবে, তাদের মাঝে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার সেই প্রার্থনা প্রত্যাহার করে নিলাম। আমার কবর এফডিসিতে হোক এখন আর আমি এটা চাই না। এর কারণ হিসেবে বলব-এখন এফডিসিতে যে সব ছবি তৈরী হয়, তাতে আমার দেশের কালচার নেই। এখন ছবি বিজাতীয় কালচারে। যেখানে আমার দেশের কালচার নেই, সেই মাটিতে আমার কবর হউক এটা আমি চাই না। এফডিসির মাটিতে আমার কবর দেয়া হলে আমার আত্মা কষ্ট পাবে। যে ইন্ড্রাষ্ট্রির ছবিতে আমাদের কালচার নেই সেখানে (এফডিসিতে) আমার লাশ নিয়ে গেলে লাশকে অপমান করা হবে। আমি এখন আর ছবিতে অভিনয় করি না। এই না করার পেছনে আমার রাগ, অভিমান দু'টোই কাজ করছে। কেননা, আমি বাংলাদেশে বসে হিন্দি ছবিতে অভিনয় করতে ইচ্ছুক নই। এখন এফডিসিতে যে সব ছবি তৈরী হয় তার ভাষাই শুধু বাংলাটা আছে। কিন্তু বাংলাদেশী কালচার নেই । যে ছবিতে আমাদের কালচার নেই

শেষ জীবন ও মৃত্যু

সুমিতা ২০০৪ সালের ৬ জানুয়ারি, ঢাকার বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে কিংবদন্তীতুল্য একদা রূপালী জগতের নন্দিত অভিনেত্রী, গ্ল্যামার গার্ল চিত্রজগতের ফার্ষ্ট লেডী চরম আর্থিক দুগর্তি, অসুস্ততা ও নানাবিধ সংকটের স্বীকার হন। ১৯৭৪ সালে তিনি সাপ্তাহিক চিত্রালীতে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন 'রূঢ় বাস্তবের তীব্র কষাঘাতকে সহ্য করতে না পেরে অবশেষে আমি চরিত্রাভিনয় করতে বাধ্য হয়েছি.....। নইলে যে আমার সংসার চলবে না। আমার টেলিফোন লাইন কেটে দিয়েছে বিল দিতে পারিনি বলে। সাত দিনে একদিন বাজার হয় টাকা নেই বলে........। আমার জমি নেই, আমার ব্যাংক ব্যালান্স নেই........। পরিচালকরা পাওনা টাকা না দিয়েই লাপাত্তা হয়ে যায়....। (সাপ্তাহিক চিত্রালী ১৫ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪)।

ঐ সময় অন্য একটি পত্রিকায় তার সম্পর্কে লেখা হয় ঢাকার ছবি পাড়ার দিদি অর্থাৎ সুমিতা দেবী একদিন অভিমান করে বললেন, জানেন, এ দিদির বাড়ি থেকেই ইন্ড্রাষ্টির জন্য, অনেকে বড় হয়েছে। আজ তারা আমার খোজটুকু পর্যন্ত নেয় না। কোলকাতা থেকে থিয়েটারের জন্য

একটা অফার এসেছে ভাবছি চলে যাব। আমাকে বাচতে হবে তো। ছেলে মেয়েকে বাচাতে হবে......। সুমিতা নিজেই বললেন আমার জীবন একটা উপন্যাস। হয়তো এরচেয়েও বড় বিচিত্র। (পাক্ষিক বিনোদন, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ-৫৪)

তাঁর বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তী সুমিতা দেবীর মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর কর্মময় জীবন সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্যাদির আলোকে সংবাদ ছাপা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। এছাড়াও সুমিতা দেবীর কর্মময় জীবনের প্রতি সম্মাননা জানানোর জন্য দৈনিক মানব জমিন ও দৈনিক জনকণ্ঠে সম্পাদকীয়ও ছাপা হয়।

চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি সুমিতা দেবীর চিরবিদায়ঃ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জীবন্ত কিংবদন্তী সুমিতা দেবী সংস্কৃতি অংগনে অসংখ্য কীতি পিছনে ফেলে চিরতরে বিদায় নিলেন। 'আকাশ আর মাটি' ছবির মধ্য দিয়ে সকলের সামনে এসে শেষ পর্যন্ত তিনি আকারশ ও মাটির পানেই ছুটলেন। মঙ্গলবার সকাল ৯.৪০ মিনিটে মাটির পানেই ছুটলেন। মঙ্গলবার সকাল ৯.৪০ মিনিটে ধানমন্ডিস্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সুমিতা দেবী ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি রাজিউন)। জীবদ্দশায় একে একে ৬৮টি বছর পার করলেও বেশিরভাগ সময় তিনি কাটিয়েছেন মানুষ, মানবতা ও সংস্কৃতি অঙ্গনের কল্যাণে। সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বিচরণ ও চর্চা সদা উজ্জ্বল ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে এদেশের চলচ্চিত্রে তিনিই প্রথম নায়িকা হবার সাহস দেখিয়েছিলেন। '৭১ এর স্মৃতিবিজড়িত মহাযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ আজও দেশবাসীকে অনুপ্রানিত করছে।

সুমিতা দেবীর লাশ মঙ্গলবার সিএমএইচ মরচুয়ারিতে রাখা হয়। আজ বুধবার সকাল ৯টায় এফডিসিতে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সকাল ১০.৩০ পর্যন্ত শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য লাশ রাখা হবে। সকাল ১১টায় লাশ নেয়া হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে। সেখানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও নাগরিক শোকসভা আয়োজনের পর বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। বিকালে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী মুক্তিযোদ্ধা কবরস্থানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর লাশ দাফন করা হবে। তত্ত্বাবধানে থাকবে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।

সুমিতা দেবী দীর্ঘদিন কিডনিজনিত রোগে ভুগছিলেন। অবস্থার অবনতি হলে গত ১৫ নভেম্বর তাঁকে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেশিরভাগ সময়ই তিনি কোমায় ছিলেন। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। কিডনি সমস্যা অনেকটা সেরে উঠলেও গত সোমবার আকস্মিকভাবে তাঁর শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে। চিকিৎসকরা হাল ছেড়ে দেন। ঐদিন কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থাটিও খুলে ফেলা হয়। সময় পেরুতেই অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে থাকে এবং সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে তিনি মারা যান। সকালেই তাঁর লাশ মোহাম্মদপুর হুমায়ূন রোডস্থ বাড়িতে নিয়ে আসার পর এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। আত্মীয় স্বজন, সহকর্মী, পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। স্থানীয় মসজিদে বাদ আছর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

সুমিতা দেবীর জন্ম ১৯৩৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। তাঁর গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার দক্ষিণখান গ্রামে। সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শহীদ জহির রায়হান তাঁর স্বামী ছিলেন। তিনি তিন পুত্র বিপুল রায়হান, অনল রায়হান, কল্লোল পালিত কন্যা অর্পিতা অসংখ্য শুভাকাঙ্খী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া অসংখ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। চলচ্চিত্রে সুমিতা দেবীর আবির্ভাব ঘটে এফডিসির প্রথম ছবি 'আসিয়া'র নায়িকা হিসেবে। চিত্রগ্রহণ হলেও ছবিটি তখন মুক্তি পায়নি। এফডিসির প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'আকাশ আর মাটি'। এ ছবিতেও তিনি নায়িকা ছিলেন। এরপর আর তাঁর অভিনয় জীবন থেমে থাকেনি। একাধারে চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, রেডিও, মঞ্চ সকল মিডিয়ায় দাপটের সঙ্গে বিচরণ করেছেন। প্রযোজনা সংস্থা মিতা ফিল্মস থেকে তাঁর প্রযোজিত পাঁচটি চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। এগুলো হচ্ছে 'মায়ার সংসার', 'আদর্শ ছাপাখানা', 'নতুন প্রভাত', 'আগুন নিয়ে খেলা' ও 'মোমের আলো'। নায়িকা হিসেবে তাঁর অভিনীত 'এদেশ তোমার আমার', 'কখনও আসেনি'. 'সোনার কাজল', 'কাঁচের দেয়াল', 'এইতো জীবন', 'দুই দিগন্ত', ছবিগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়্ তাঁর অভিনীত শেষ ছবি 'বিদ্রোহী সিপাহী' বছর কয়েক আগে মুক্তি পায়। এর পরই তিনি চলচ্চিত্র জগত থেকে দূরে সরে যান। সুমিতা দেবীর জীবদ্দশায় পুরস্কার ও সম্মান প্রাপ্তির ঘটনাও বৈচিত্র্যে ভরা। অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছে তিনি। পাকিস্তানের প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১৯৬৪ সালে তিনি কাঁচের দেয়াল ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ নায়িকার পুরস্কার পান। পাকিস্তানের প্রথম রঙিন ছবি 'সঙ্গম' এর নায়িকা হিসেবে তিনি 'নিগার' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মাননাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনকণ্ঠ

সম্মাননা'০২, (ঘোষণা করা হয় ১ জানুয়ারি'০৩), রেডরোষ্টার পদক'০২, টেনাশিনাস পদক'৯০, চলচ্চিত্র সম্মাননা'৯০, কমিটমেন্ট'৯৫, জাপল'০০, উদীচী'৯৯, আইডিআই সম্মাননা'৯৯, জব্বারখান স্বর্ণপদক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি '৯৬, মুক্তিযুদ্ধ উৎসব ত্রিপুরা সাংগঠনিক কমিটি সম্মাননা, ঋষিজ সম্মাননা, কলকাতার আর্ট ফোরাম সম্মাননা, কৃবাসএ সম্মাননা'৯১, চলচ্চিত্র শতবর্ষপূর্থিতে সম্মাননা, এফডিসি '৮৩, বাচসাস'৯৮, চতুরঙ্গ,৭২ ও তারকালোক'৯৫ সম্মাননা পুরস্কার।

শেখ হাসিনার শোক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এক শোক বিবৃতিতে ষাটের দশকের সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র নায়িকা শহীদ জহির রায়হানের সহধর্মিনী সুমিতা দেবরি মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি নায়িকা সুমিতা দেবীর মৃত্যুতে চলচ্চিত্র জগত ও সংস্কৃতি অঙ্গনে বিরাট শূণ্যতার সৃষ্টি হলো। তিনি সুমিতা দেবীর শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

অন্যান্য সংগঠনের শোক

অভিনেত্রী সুমিতা দেবীর মৃত্যুতে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র অঙ্গনের বিভিন্ন সংগঠন শোকবার্তা পাঠিয়ে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে। সংগঠনগুলো হচ্ছে জাতীয় পার্টি,বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতি, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, জিয়া সাংস্কৃতিক সংগঠন (জিসাস), বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, বাংলাদেশ কালচারাল রিপোটার্স এ্যাসোসিয়েশন। (জনকণ্ঠ ৭/১/২০০৪)।

সুমিতা দেবীর প্রয়ান নক্ষত্রের পতন

সুমিতা দেবী এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন ০৬ জানুয়ারি ২০০৪ সকালে। প্রকৃতির মতো বাংলাদেশের চলচ্চিত্রাঙ্গনে নেমে এলো হৃদয় কুঁকড়ে যাওয়া হিমশীতলতা।

বাংলাদেশ জুড়ে পৌষের তীব্র শীত । সারারাত বৃষ্টির মতো টুপটাপ ঝরেছে কুয়াশা। সকালেও কুয়াশা ঘিরে রেখেছিল চারদিক। ধোঁয়াটে হয়ে আছে চারপাশ। এসবের কোনও কিছুই দেখেননি সুমিতা দেবী; কোনও কিছুই স্পর্শ করেনি তাকে। কেননা এর অনেক আগ থেকেই তিনি বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের আইসিইউতে কৃত্রিমভাবে বেঁচেছিলেন। বেঁচেছিলেন কি? টিকে ছিলেন শুধু। ডাক্তাররা তো সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন ৫ ডিসেম্বর সকালেই।

৫ ডিসেম্বর দুপুর। হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছেন সুমিতা দেবী, আমাদের চলচ্চিত্রের প্রথম 'ফার্ষ্টলেডি'। ক'দিন আগেই তিনি চলে গেছেন ডিপ কোমায়। মনিটরে উঠানামা করছে হৃদস্পন্দন। সুমিতা দেবীর শয্যাপাশে দাঁড়ানো দুই আত্মজ বিপুল রায়হান ও অনল রায়হান। বিপুল বেদনায় বিদ্ধ হয়ে বলতে থাকেন 'ডাক্তাররা সব আশা ছেড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, যে কোনও সময় চলে যেতে পারেন। সেটা হতে পারে এক ঘন্টা, দু ঘন্টা কিংবা একদিন।'

বিপুল ফোনে কথা বলছেন, এক বন্ধুকে দিয়ে খবর নেয়ালেন, না বারডেমের শবঘরে জায়গা নেই। সিএমইচ-এ শবদেহ রাখার ব্যবস্থা করা যাবে। বিপুল রায়হান জেনে গেছেন মাকে আর ফিরানো যাবে না। অনল রায়হান মা'র শয্যার পাশ থেকে উঠে একটু নিভৃতে চলে গেলেন। মা চলে যাচ্ছে এক অজানায় অসীম শূণ্যতায়-এটা কিছুতেই ও মেনে নিতে পারছিলেন না।

বিপুল ও অনলের মা, বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তী সুমিতা দেবী সব আয়োজন পেছনে রেখে চলে গেলেন।

১৯৩৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন সুমিতা দেবী। তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি আসিয়া। 'আসিয়া'ই তাকে বাংলা চলচ্চিত্রাঙ্গনে সম্রাজ্ঞীর আসনে অধিষ্ঠিত করে। তবে তার অভিনীত মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম ছবি 'আকাশ আর মাটি' । নায়িকা হিসেবে তার উল্লেখযোগ্য ছবি হলো 'আকাশ আর মাটি', 'এদেশ তোমার আমার', 'কখনও আসেনি'. 'সোনার কাজল', 'কাঁচের দেয়াল', 'এইতো জীবন', 'দুই দিগন্ত',ধূপছাঁও, ১৩ নং ফেকু ওস্তাগার লেন, অভিশাপ প্রভৃতি। এদেশের প্রথম রঙিন ছবি 'সংগমে' অভিনয় করে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। প্রায় দুইশত ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন।

অভিনয়ের পাশাপাশি সুমিতা দেবী ছবিও প্রযোজনা করেন। 'মায়ার সংসার', 'আদর্শ ছাপাখানা', 'নতুন প্রভাত', 'আগুন নিয়ে খেলা' ও 'মোমের আলো' প্রভৃতি।

শহীদ পরিবারের সদস্য সুমিতা দেবী চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের স্ত্রনী ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর '৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি নিখোঁজ বড় ভাই সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে চিরতরে হারিয়ে যান জহির রায়হান। সেই থেকে সুমিতা দেবীর জীবনে নেমে আসে এক অমানিশার অন্ধকার, অবিনাশী প্রতীক্ষার অনন্ত প্রহাণ।ছোট ছোট দুটি সন্তান নিয়ে তাঁকে আমৃত্যু লড়াই করতে হয়েছে। অসুস্থ শরীরেও শুধু অর্থনৈতিক দৈন্য কাটানোর জন্য তিনি টিভি নাটাটকে অভিনয় করেছেন। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ পরিবার হিসেবে সুমিতা দেবীর পরিবারকে রাজধানী মুহাম্মদপুরে একটি বাড়ি বরাদ্দ করেন। পরবর্তী সময়ে সামরিক সরকার এবং খালেদা সরকার বারবার নোটিশ দিয়ে বের করে দিতে চেয়েছে সুমিতা দেবী। বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় থাকতে হবে এই আতঙ্কেই থাকতে হয়েছে তাঁকে সব সময়।

২০০৩ সালের ৮ নভেম্বর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। ওই সময় থেকে তিনি কাউকে চিনতে বা কথা বলতে পারতেন না।

ডাক্তাররা জানান, সুমিতা দেবীর লাংসে সমস্যা ছিল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর টিবিও ধরা পরে। ডাক্তারদের ধারণা ১০/১২ দিন আগে কোনও এক সময় তাঁর স্ট্রোক হয়। এরপর থেকে তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। মৃত্যুর আগে প্রায় দু'দিন ইউরিন বন্ধ থাকে। সে সময় ডাক্তাররা জানান, তাঁর আর বাঁচার আশা নেই।

বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা দেশরত্ন শেখ হাসিনা এক শোক বিবৃতিতে ৬০ দশকের সাড়া সাজানো চলচ্চিত্র নায়িকা, প্রথিতযথা অভিনেত্রী, চলচ্চিত্রকার এবং বাংলাদেশের খ্যাতিমান চলচ্চিত্র পরিচালক, ঔপন্যাসিক ও সংস্কৃতি সংস্কৃতি অংগনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শহীদ জহির রায়হানের সহধর্মিনী সুমিতা দেবীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তী নায়িকা সুমিতা দেবীর মৃত্যুতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগৎ ও সংস্কৃতি অঙ্গনে বিরাট শূণ্যতার সৃষ্টি হলো।

৬ ডিসেম্বর সকালে মৃত্যুর পর সুমিতা দেবীর মরদেহ প্রথমে নেয়া হয় মোহাম্মদ তাঁর বাসভবনে । ওখান থেকে নিয়ে লাশ রাখা হয সিএমইচ'র শবাগারে। ৭ জানুয়ারি সকাল ৯.০০টা থেকে ১০ঃ৩০ পর্যন্ত তার মরদেহ রাখা হয় কর্মস্থল এফডিসিতে। ওখানে চলচ্চিত্র অঙ্গনের তিন প্রজন্ম তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এরপর সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সুমিতা দেবীর মরদেহ রাখা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে। এখানে সর্বস্তরের জনতা তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে তার নামাজে জানাজার পর মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্তানে সমাহিত করা হয়।

সুমিতা দেবী যার ডাক নাম ছিল হেনা। তার মৃত্যুতে একটা নক্ষত্রের পতন ঘটল। (সাপ্তাহিক বিচিত্রা ৯/১/২০০৪)।

সুমিতার শেষ কথা

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যে গৌরবোজ্জল ইতিহাস সেখানে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে সুমিতা দেবীর নাম। আজ তিনি নেই। চিরসত্য মৃত্যুর আহবানে তিনি এখন কেবলই স্মৃতি। শরীরের জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার আগে জাতীয় একটি দৈনিকের প্রতিবেদকের সাথে তিনি কথা বলেছিলেন চলচ্চিত্রের বর্তমান সময়কে নিয়ে। যেখানে স্পতই ফুটে উঠেছিল দুঃস্বপ্ন, হতাশা আর কষ্টের কথা। সেই দীর্ঘ আলোচনার উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

আপনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন না বললেই চলে?

বর্তমানের চলচ্চিত্রে আমাদের সংস্কৃতির কতটুটু উপস্থিত আছে বলতে পারেন। অশ্লীলতা আর নগ্নতার ছড়াছড়ি আজকের চলচ্চিত্রে। এমন ধরণের চলচ্চিত্রে অভিনয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনি বলতে চাইছেন আমাদের চলচ্চিত্রে বাঙালী সংস্কৃতির কোন ছোঁয়া নেই?

একেবারেই নেই। ।হিন্দী ছবির কাহিনী চুরি করে একটি ছবি তৈরী করা হচ্ছে। বর্তমানে চলচ্চিত্রে কোন মৌলকত্ব আছে? বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার অফুরন্ত গল্প সমৃদ্ধ। সেখান থেকেই তো ভাল ছবি হতে পারে। এমন চলচ্চিত্রের জন্য কারা দায়ী?

এখানকার চলচ্চিত্র জগতই দায়ী ।আমার কি মনে হয় জানেন আমাদের সোশ্যাল কমিটমেন্টের অভাব। নইলে অযোগ্য মেধাহীন এবং কুরুচিপূর্ণ কিছু মানুষ চলচ্চিত্রের পরিচালক হবার যোগ্যতা রাখেন না। শুধুমাত্র টাকার জোরে তারা এ জগতে প্রবেশ করে পরিচালক/প্রযোজক হয়ে ছবি তৈরী করে যাচ্ছেন। টাকার জোরে হয়তো কিছু কিছু কাজ করা সম্ভব। কিন্তু শিল্প? শিল্প কি সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমানে ঢাকার চলচ্চিত্রের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে তারা মনে হয় এই কথাটা ভুলে গেছেন।

এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায়? ?

নোংরা ছবির বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে হবে। এছাড়া মুক্তির আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা আছে কিনা আমার জানা নেই।

এখন একটু অন্য কথায় ফিরে আসি। অতীত দিনের কথা মনে হয়? যখন আপনি চলচ্চিত্রের ফার্স্ট লেডি ছিলেন?

মুচকি হেসে উত্তর দেন সুমিতা। অতীত আছে বলেই তো মানুষ বেঁচে আছে। এগিয়ে চলে। অতীতকে সঙ্গী করেই একজন মানুষ রাতের স্বপ্ন দেখে।

আপনি তো একসময় নিয়মিত এফডিসিতে যেতেন ।কিন্তু এখন আপনাকে...

একসময় এফডিসিতে যাওয়া ছিল আমার রুটিন ওয়ার্কের মতো। এখন আর যাই না। এর জন্য কষ্ট হয় তাই আর যাই না।

জনকণ্ঠ প্রতিভা সম্মাননা পাওয়ার পর কেমন লেগেছে?

সরকার আমাকে কোন পুরস্কার দেয়নি। জাতীয় পুরস্কারসহ অন্যান্য পুরস্কারও নাকি লবিং করে নেযা যায়। আমার এমন ধরণের কোন পুরস্কারের দরকার নেই। এর চেয়ে জনকণ্ঠের পুরস্কার আমার কাছে অনেক মূল্যবান। জনকণ্ঠ যাকে সম্মান দেখাচ্ছে আমি মনে করি এটা জন্য বিশাল সম্মানের। এটা যে বিশাল একটা প্রাপ্তি-তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি জনকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিকসহ সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সুমিতা দেবী একজন মুক্তিযোদ্ধা- ছিলেন দুর্দান্ত অভিনেত্রীও। প্রচণ্ড অভিমানী এই মানুষটি আর কোনদিন দাড়াবেন না ক্যামেরার সামনে। তবুও তিনি বেঁচে থাকবেন সাধারণ দর্শকের হৃদয়ের গভীরে-যেখানে শুধুই স্বপ্নের বসবাস। (১৫/১/২০০৪, ঢাকা, দৈনিক জনকণ্ঠ)

সুমিতা দেবীকে নিয়ে শোকার্ত উচ্চারণ

সুমিতা দেবী। অসাম্প্রদায়িক, মহৎ হৃদয়ের মানুষ। জননন্দিত অভিনয় শিল্পী। এখন তিনি আমাদের মাঝে নেই-বিদায় নিয়েছেন চিরতরে এই মুক্তিযোদ্ধা অভিনয় শিল্পী। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সঙ্গে জড়ানো মানুষটিকে হারিয়ে শোকার্ত উচ্চারণ করেছেন

এটিএম শামসুজ্জামান, অভিনেতা

প্রকৃতির নির্মম আচরণেই আমাদের চারপাশের আপনজনের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। একদিন আমিও এই নির্মম সত্যের পথে এগুবো। হয়ত সেখানেই সুমিতা দেবীর সঙ্গে দেখা হবে। এ বিষয়ে আর কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না।

মঞ্জুর হোসেন, অভিনেতা

এ দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই সুমিতা দেবীর সঙ্গে ছিল আমার গভীর ঘনিষ্ঠতা। একজন চমৎকার হৃদয়ের মানুষ ছিলেন তিনি। একজন অভিনেত্রী হিসাবে তাঁর মূল্যায়ন করবে ইতিহাস-এর চেয়ে বেশী কিছু বলার নেই।

কল্লোল রায়হান, অভিনেতা

স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি আমার মা। একজন মা তাঁর সন্তানের কী ধরণের বন্ধু হতে পারে, তা হয়ত কোনদিনই আমার উপলব্ধিতে আসত না যদি না সুমিতা দেবী আমার মা হতেন।

একজন অভিনয় শিল্পী হিসাবে তিনি যে মাপের ছিলেন সেই অনুযায়ী তাঁর মূল্যায়ন হয়নি। 'কখন আসেনি' ছবির নামের মতোই মনে হয় আমার মা কোনদিনই চলচ্চিত্রে আসেননি!

বিপুল রায়হান, সাংবাদিক ও নাট্য পরিচালক

আমার গর্ভধারিনী মাকে আমি বরাবর বন্ধু হিসাবে পেয়েছি। কখনও কখনও তাঁকে দেখেছি অবোধ শিশুর মতো আচরণ করতে। অত্যন্ত প্রাণশক্তির অধিকারিণী ছিলেন। যে মাপের একজন শিল্পী হয়ত তার চেয়েও বড় মাপের একজন অভিনেত্রী ছিলেন তিনি। তার শিল্পচর্চায় কো ফাঁক খুঁজে পাইনি। নিশ্চিতভাবেই তাকে অনুসরণ করা যায়।

অনল রায়হান, সাংবাদিক

বাবা (শহীদ বুদ্ধিজীবী জহির রায়হান) ছিলেন বরাবরই আমার কাছে রোমান্টিক ঘরানার মানুষ। কিন্তু আমি সব সময়ই গর্ববোধ করেছি মা'র পরিচয় দিয়ে। আমার ধারণা আমাদের চার ভাইবোনের অনুভূতি এক্ষেত্রে একই হবে। বাবার জীবন থেকে আমি সবটুকু গ্রহণ পারিনি। অবশ্য তাঁর রাজনৈতিকচেতনা ও বিশ্বাস আমি হৃদয়ে ধারণ করেছি। কিন্তু সেই চেতনা বিকাশের সমগ্রতা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন আমার মা। হনে হয়, তাঁর চিন্তা চেতনা ও জীবনাচরণ দ্বারাই আমি প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত।

বেঁচে থাকতে তিনি এই চলচ্চিত্র জগত বা দেশের সাংস্কৃতিক সামাজিক সংগঠন ও প্রসিত্ষ্ঠান থেকে কি পেয়েছেন তা জানি না, তবে সন্তান হিসাবে আমার কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্যটুকু পাননি। তাঁর মৃত্যুর পর কাছাকাছি সময়ে হাসপাতালে বার বার এই আক্ষেপটাই আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। তখন আমি জেনে গেছি ঃ, মাকে আমি হারাচ্ছি। এখন তাঁর আত্মার জন্য যত কিছুই করি না কেন সেটা প্রহসন ছাড়া কিছুই হবে না। কারণ এই মানুষটি বেঁচে থাকতে কিছুই আমি করিনি।

আসাদ চৌধুরী, কবি ও সাহিত্যিক

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ভিত্তি যখন তৈরী হচ্ছিল তখন তিনি চলচ্চিত্রে এসেছিলেন। আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গন সমৃদ্ধ হয়েছে যে ক'জন শিল্পীর মাধ্যমে, সুমিতা দেবী ছিলেন তাঁদেরই একজন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান ছিল বিশাল। দেশপ্রেমের দীপশিখা ছিলেন সুমিতা দেবী। চমৎকার হৃদয়ের এই মানুষটির ব্যক্তিত্ব ছিল মুগ্ধ হওয়ার মতো।

মামুনুর রশিদ, অভিনেতা ও নাট্যকার

মহৎ হৃদয়ের এই মানুষটি ছিলেন আমাদের অত্যন্ত কাছের। প্রিয়তম অভিনয় শিল্পী। আমাদের অগ্রপথিক সুমিতা দেবী যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন তাতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবনের অনিশ্চয়তা দেখে আমরাও ক্ষুব্ধ হয়েছি। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, আমাদের দায়িত্ব আমরাও পালন করিনি।

আবু সাইয়ীদ, চলচ্চিত্র পরিচালক

ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিতি ছিলাম। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিশাল শূণ্যতা অনুভব করছি। আমার মনে হয় অভিনেত্রী হিসাবে তিনি যে মানের ছিলেন সেই অনুযায়ী তাঁকে ব্যবহার করা হয়নি। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের ব্যর্থতা।

শমী কায়সার, টিভি ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রী

সত্যিকারভাবে বলতে গেলে বলতে হয় কিছুই বলার নেই। তারপরও...।

সুমিতা দেবী ছিলেন আমার আপন চাচি। এই পরিচয়ে তাকে যতটা না শ্রদ্ধা করি তার চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি একজন শিল্পী হিসেবে। কারন তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন শিল্পী ।

সারাটা জীবন তিনি আদর্শের সঙ্গে লড়াই করেছেন। হার মানেননি। শিল্পকে ভালবেসে জীবনভর জ্বলেছেন আর একা একা পুরেছেন। একটাই সান্তনা-তিনি আপোষ করেননি।

ইলিয়াস কাঞ্চন, চলচ্চিত্রাভিনেতা

মানুষ মরে গেলে অনেকেই কাঁদেন, আফসোস করেন। অথচ বেঁচে থাকতে কেউই খোঁজ নেন না। এটা আমার কোন কথা নয়। সুমিতা দেবীই একদিন আমাকে এ কথা বলেছিলেন।

বেবী জামান, চলচ্চিত্রাভিনেতা

বহুদিন ধরে তাঁকে আমি জানি। একত্রে খুব বেশি ছবিতে অভিনয় না করলেও তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল চমৎকার। আজীবন আমি ভাবীকে মিস করব। আসলে এ নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই।

অমিত হাসান, চলচ্চিত্রাভিনেতা

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সুমিতা দেবীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের হৃদয়ে। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫/১/২০০৪)।

সুমিতা দেবী (সম্পাদকীয়)

বিশিষ্ট অভিনেত্রী সুমিতা দেবী আর নেই। মঙ্গলবার রাজধানীর এটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি..... রাজিউন)। গত কয়েক মাস ধরে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সুমিতা দেবী আমাদের চলচ্চিত্র জগতে এমন একজন অভিনেত্রী যাকে এই জগতের 'ফার্ষ্ট লেডি' বলা হয়। কথাটা আক্ষরিক অর্থেই সত্যি। আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের প্রায় সূচনাকাল থেকে এই শিল্পটির সঙ্গে হাত ধরে এগিয়েছেন তিনি। ভিন্ন কথায় আমাদের নবীন চলচ্চিত্র শিল্প তাঁর এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেছে। সুমিতা দেবী এই শিল্পটির সাবলীল গতিতে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করেছেন।এসব কারণে তিনি এ দেশের চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি নায়িকা হয়ে উঠেছেন। চলচ্চিত্রে তাঁর আবির্ভাব এফডিসির প্রথম ছবি 'আসিয়া'র নায়িকা হিসাবে। ছবিটির কাজ হয়ে গেলেও সে সময় ছবিটি মুক্তি পায়নি। এফডিসির মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবি 'আকাশ আর মাটি'। এছবির নায়িকাও তিনি। এরপর আর থেমে থাকেননি তিনি। একের পর এক ছতি হতে থাকে তাঁর। শুধু চলচ্চিত্রেই নয়, রেডিও, টেলিভিশন, মঞ্চ-সকল মাধ্যমেই তিনি বিচরণ করেছেন দাপটের সঙ্গে। এমন একটা সময় গেছে যখন এদেশের চলচ্চিত্রে তিনিই ছিলেন একমাত্র জনপ্রিয় নায়িকা। অবশ্য জনপ্রিয় তিনি সব সময়ই ছিলেন, তা চলচ্চিত্রেই হোক, টিভি-রেডিওর নাটকেই হোক কিংবা মঞ্চ নাটকেই হোক। নায়িকা হিসাবে তাঁর যোগ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা , যার জন্য তিনি সর্বস্তরের দর্শকদের হৃদয় জয় করেছিলেন। তার প্রায় সকল ছবিই জনপ্রিয় হয়েছে। তবে নায়িকা হিসাবে তাঁর অভিনীত 'এ দেশ তোমার আমার' 'কখনও আসেনি', 'সোনার কাজল', 'কাঁচের দেয়াল','এইতো জীবন', 'দুই দিগন্ত' ইত্যাদি ছবি বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা পায়। তিনি চলচ্চিত্রে শুধু অভিনয়ই করেননি, বেশ কয়েকটি ছবিও প্রযোজনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে 'মায়ার সংসার' ,'আগুন নিয়ে খেলা', 'আদর্শ ছাপাখানা', ইত্যাদি। জীবনে তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন। শ্রেষ্ঠ নায়িকার পুরস্কারসহ নানা পুরস্কার দেয়া হয়েছে তাঁকে। তার পুরস্কারের তালিকা দীর্ঘ। তাঁর স্বামী এ দেশের কিংবদন্তিতুল্য চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান।

প্রতিভাময়ী এই তারকার প্রতিভাবে সম্মান জানিয়েছে জনকণ্ঠ ২০০২ সালের জনকণ্ঠ প্রতিভা সম্মাননায় ভূষিত করে। এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সূচনা ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়, তাদের প্রথম সারির একজন সুমিতা দেবী, এক অসাধারণ প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হিসাবে পৌঁছেছিলেন খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে। চিত্রনায়িকা হিসাবে প্রিয়দর্শিনী এই তারকা গোটা ষাট দশকজুরে যে

একচ্ছত্র দর্শকনন্দিত হয়েছিলেন তার পিছনে ছিল তার এই অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা। দীর্ঘ অভিনয় জীবনে তিনি দেড় থেকে দু'শ ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর এই অবদান ও প্রতিভার জন্যই জনকণ্ঠ তাকে প্রতিভা সম্মাননা দিয়ে তার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

যে সময়ে এদেশের চলচ্চিত্রে তিনি পর্দাপন করেন, সে যুগটা ছিল ভিন্ন রকমের। তখন চলচ্চিত্রে অভিনয় করা মেয়েদের জন্য ছিল যথেস্ট সাহসের ব্যাপার। এক্ষেত্রে যেন একটা বাধা খাড়া করা ছিল। খুব কম মেয়েই এ সময় উৎসাহিত হতো অভিনয়ের ব্যাপারে। চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে এই অচলায়তন যাঁরা ভেঙ্গেছেন তাদের মধ্যে অগ্রন্যদের একজন সুমিতা দেবী। এদেশের চলচ্চিত্র শিল্প তাকে ভুলবে না। দর্শকরাও ভুলবে না তাঁকে। সুমিতা দেবীর মৃতুতে তার হাজার হাজার গুণমুগ্ধের মতো আমরাও গভীরভাবে শোকাভিভূত। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলের প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। (জনকণ্ঠ,৯/১/২০০৪)

অনুপম হায়াৎ লিখেছেন

চলচ্চিত্রের ফার্স্ট লেডির বিদায়

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ফাস্ট লেডি এফডিসিতে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র 'আসিয়া'র নায়িকা, ফতেহ লোহানী, নাজীর আহমদ, খান আতাউর রহমানের মানস কন্যা, জহির রায়হানের স্ত্রী বহু চলচ্চিত্র মঞ্চ-বেতার-টিভি নাটকের শিল্পী, চলচ্চিত্র প্রযোজিকা, একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের-শব্দসৈনিক, বহু চিত্রকর্মীর অভিভাবিকা , কল্লোল-বিপুল-অনলের স্নেহময়ী জননী, দুস্থ শিল্পী ও মানবতায় নিবেদিত প্রাণ, লক্ষ কোটি দর্শক শ্রোতা নন্দিত 'স্বপ্নের 'দেব' সুমিতা আর নেই। চিরদিনের মতো চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে।

গত ৬ জানুয়ারি সুমিতা দেবী চিরতরে ছেড়ে গেছে এই নশ্বর পৃথিবীর মায়া। ৭ জানুয়ারি পুর্ণরাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার লাশ দাফন করা হয়েছে। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবি গোরস্তানে। সৈয়দ শামসুল হক বলেছেন 'সুমিতা দেবীর মৃত্যু যেন একটি কুসুম ঝড়ে পড়া' অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বললেন; 'তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ প্রকজন প্রগতিশীল মানুষ। কবরী সারোয়ার বললেন , সুমিতা দেবী ছিলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জীবন্ত ইতিহাস'। আজ সুমিতা নেই। না, সুমিতা নয়, সেদিনের হেনা ভট্টাচার্য (লাহিড়ী) কিভাবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন তা জানা যায় আসিয়ায় (১৯৫৭-৬০) পরিচালক ফতেহ লোহানীর লেখায়ঃ

'১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি।.... একদিন একটি মেয়ে এলেন আমার বাসায় দেখা করতে। ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রং শ্যামলা। অমায়িক হাসি ছড়িয়ে অভিবাদন জানালেন। বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন..। নাম সুধালাম। বললেন হেনা, হেনা লাহিড়ী। আমি বললাম উহু, আজ থেকে আপনি সুমিতা। ছবির সত্যিকার প্রাণ সঞ্চার করেন যাঁরা, তাঁরা হচ্ছেন ছবির অভিনেতা/অভিনেত্রী। সেদিনকার সেই অনাড়ম্বর মেয়ে সুমিতার মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা লুকিয়ে ছিল। আমি ওঁকে শুধু সাহায্য করেছি মাত্র। অতপর সেই আসিয়া ১৯৬০ সালে মুক্তি পেয়ে সারা পাকিস্তানে শ্রেষ্ঠ বাংলা চলচ্চিত্র হিসাবে প্রেসিডেন্ট পদ পেয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করে। লোকজ কথা আর সুরে সুরে মাখা 'আসিয়া'র ফ্রেমে ফ্রেমে ছিল গ্রাম বাংলার ঘটনা ও পরিবেশ। আর এমন চলচ্চিত্রে যেন পদ্মস্বর হয়ে নেমেছিলেন ডাগর চোখের কাজলটানা সুখদ মুখশ্রী আর প্রতিমার মতো সুন্দরী অভিনেত্রী সুমিতা।

অতপর কত ছবি কত নাম যেন সুমিতার জন্যেই তৈরী হলো সেসব চলচ্চিত্র। আর যেসব চলচ্চিত্রের নায়িকা চরিত্র। কেউ হলেন পরিচালক কেউ হলেন গায়ক সুরকার কেউ রইলেন নেপথ্য স্থপথি হয়েও। সুমিতার অভিনয় -হাস্য লাস্য-কমলতা ভঙ্গিমারীলা-দোতান-ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হলো এহতেশামের এদেশ তোমার আমার (১৯৫৯), ফতেহ লোহানীর আকাশ আর মাটি (১৯৫৯), সালাহউদ্দীনের যে নদী মরু পথে (১৯৬১), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), সংগ্রাম(১৯৬৪), বেহুলা (১৯৬৬), ওবায়েদ উল হকের 'দুই দিগন্ত' (১৯৬৪), জিল্লুর রহিমের এইতো জীবন (১৯৬৪), রাশেদ আসগর চৌধুরীর অভিশাপ (১৯৬৯) প্রভৃতি। পঞ্চাষ ও ষাট দশকে ঢাকার চলচ্চিত্রে তাঁর দাপট ও অভিনয় নৈপুন্য ছিল প্রবাদ তুল্য। ছায়াছবির বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেই ওই সময় তাকে প্রতিদ্বন্দিতা করতে হয়েছে ব্রিজিত বার্দো, নীলু, সাবিহা, নার্গিস, মধুবালা, মনরো, সুচিত্রা সেন, প্রমুখ নায়িকার সঙ্গে।

সুমিতা দেবী নিজে অভিনয়ের পাশাপাশি অনেককে। পরিচালক কুশলী ও শিল্পী হতে সহায়তা করেছিলেন। তাঁরই পৃষ্টপোষকতায় জহির রায়হান 'কখনও আসেনি'র পরিচালক হয়েছিলেন প্রথম। তাঁরই প্রযোজনায় আমজাদ হোসেন ও নুরু হক বাচ্চু হয়েছিলেন আগুন নিয়ে

খেলার (১৯৬৯)পরিচালক, তাঁর নতুন প্রভাত (১৯৭০), চিত্রে নবাগত আনসার ও নতুন জুটি হয়েছিলেন। পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম ১৯৬৪-১৯৬৭ পর্যন্ত তার স্নেহ ছায়ায় ছিলেন।

সুমিতা দেবীর ব্যক্তিগত, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন নানা কারণে সুখের হয়নি। তিনি ছিলেন খুবই দৃঢ়চেতা, আবেগপ্রবণ ও অভিমানী। শিল্পের বিনীত বন্দনায় নিবেদিত সুমিতা ১৯৭১ সালে মহা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ওই সময় কলকাতার রাস্তার মিছিলে তার হুঙ্কার সদৃশ প্রতিবাদ ও স্লোগান বিশ্বের বগু গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংম নিয়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে করেছিলেন।

সুমিতা দেবীর জীবন ও কর্ম ছিল মহাকাব্যতুল্য। তাঁর জীবনের কথকথা তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 'আমার কথা' নামে স্মৃতিচারণে (যা পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে)।

সুমিতা দেবী বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের 'ফার্স্ট লেডি' ছিলেন অবশ্যই। সেই সঙ্গে ছিলেন মহিলা শিল্পীদের অন্যতম অগ্রপথিক এবং আজীবন-দুঃখের দহনে পোড়া এক শুদ্ধ শিল্পী। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় তাঁর লাশ আচ্ছাদিত হতে দেখে অভিনেতা-প্রযোজক ইলিয়াস কাঞ্চন এর কারণ জানতে চাইলেন। জবাবে বললাম : সুমিতা দেবী ছিলেন একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা। সুমিতার এমন আরও অবদানের কথা হয়ত অনেকেই জানে না। এই মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এবং আসিয়া, কখনও আসেনি, কাঁচের দেয়াল, সংগ্রাম, এইতো জীবন, বেহুলা, অভিশাপসহ আরও অনেক ছবির অভিনেত্রী সুমিতার জন্য অনেকের হৃদয় বারবার আবেগে আপ্লুত হবে।

এই নিবন্ধের ইতি টানতে চাই অভিনেতা আনোয়ার হোসেনের একটি মন্তব্য দিয়ে ঃ

.... বরাবরাই তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সুমিতার ছিল প্রখর মেধা। কী সুস্পষ্ট দৃঢ় উচ্চারণ" শিল্পের জন্য কি অনিঃশেষ আত্মত্যাগ'" নিছক বাণিজ্যের এই সময়ে সুমিতা দেবীর মতো নির্লোভ, অকপট ও শুদ্ধ শিল্পী কুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।' (জনকণ্ঠ, ১৫/১/২০০৪)

(৫) নবারুন (১৯৫৯-৬০)

সুমিতা নাজীর আহমেদ পরিচালিত নবারুন একটি প্রামাণ্য চিত্র। এ প্রামাণ্য চিত্রে দেখানো হয়েছে পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অংগতি। তুলে ধরা হয়েছে পূর্ব বাংলায় কি ধরণের নিপীড়ন চলতো। এ চিত্রে সুমিতা দেবী প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন।

কাহিনী (এইতো জীবন)

জীবনের গতিপথ আঁকা বাঁকা।

ভাঙ্গা গড়া, সুখ, দুঃখ, হাসি কান্নায় মেশান বিচিত্র মানুষের জীবন।

জন্ম থেকে মৃত্যু-মাত্র একটি ধাপ। এরি মাঝে জীবনের খেলাঘর। এই সময়টুকুতেই মানুষের স্বপ্ন গড়ে, স্বপ্ন ভাঙ্গে। আশা আকাঙ্খার বীজ থেকে ডাল-পালা ছড়িয়ে ফুলে ফলে ভরে উঠে মহীরুহ। তার নীচে নীড় রচনা করে মানুষ কামনা করে সুখী জীবন। সুখী জীবনের জন্য চাই মনের প্রশান্তি। কিন্তু মিঃ চৌধুরী দম্ভভরে বলতেন-টাকা থাকলেই মানুষ সুখী হয়।

মিঃ চৌধুরী-রেঙ্গুনের ধনী ব্যবসায় মিঃ কাওছার চৌধুরী । স্ত্রী জরিনা বেগম, চার বছরের মেয়ে রুমা আর দু'বছরের মেয়ে মিতাকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার।

১৯৪২ সাল। ভয়াবহ যুদ্ধের বিষবাষ্পে পৃথিবীর আকাশ বাতাস ধূমায়িত। মহামারী, দূর্ভিক্ষ ইত্যাদি মানুষের জীবনকে গ্রাস করছে। এ সময়ে আমাদের মিঃ চৌধুরী দু'হাতে রোজগার করে লক্ষ লক্ষ টাকা জমিয়ে তার উপর বসে আত্ম প্রসাদ লাভ করেছেন। দুঃস্থ মানবাত্মার কান্না তাঁর কানে পৌছায় না। যারা না খেতে পেয়ে মরে। রোগ যন্ত্রণায় কাতরায়-যাদের মা গুজবার ঠাঁই নেই-সহায় নেই-সম্বল নেই-তাদেরকে তিনি আপদ মনে করেন। মরিয়া হয়ে তিনি টাকার পেছনে ছুটে চলেন। কোটীপতি হওয়া স্বপ্নে দিশেহারা।

জরিনা বেগম বলেন-যতপার রোজগার। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা অযথা আটক রে রেখো না। যারা তা করে-তারা দেশের শত্রু তারা মানবতার শত্রু। । ঠাকা কারও হাতে চিরকাল বন্দি হয়ে থাকে না। তার চেয়ে কল্যানের কাজে টাকা খাটাও-যত পার শুভেচ্ছ আর আর্শীবাদ কুড়িয়ে নাও। মনের প্রশান্তি পাবে। জীবন তোমার সুখী হবে। ওসব তত্ত্বকথা পুথি পত্রের ধূলি। ওগুলোতে মিঃ চৌধুরীর বিশ্বাস নেই। জীবনের স্কুলে তিনি অন্য কথা শিখেছেন। বুদ্ধি খাটিয়ে যে টাকা রোজগার করেছেন তা বিলিয়ে দিয়ে ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে আশীর্বাদ কুড়িয়ে বেড়াবেন এমন নির্বুদ্ধিতার কাজ তিনি করবেন না। তিনি জানেন টাকা যতক্ষণ হাতের মুঠোর মধ্যে আটকে রাখবেন-যতক্ষন হাতের মুঠোর মধ্যে আটকে রাখবেন।-সুখ আর শান্তি এমনিই এসে ভীড় জমাবে।

মানুষের কাছে সৃষ্টির আনন্দটাই তো বড়, তাই না? আমি তো অভিনয়েও এসেছিলাম অভিনয়ের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার টানে। অভিনয়ে এসে তো আমি অনেক কিছুই পেয়েছি। যশ, খ্যাতি, মানুষের ভালবাসা অনেক কিছু। অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসেবে অনেকগুলো পদকও পেয়েছি।প্রায় ১৬/১৭টির মত হবে। পুরস্কার মানুষকে হাসায় এবং কাঁদায়ও। আমার মনে হয় আমাদের দেশ থেকে মরনোত্তর পুরস্কার দেয়ার রেওয়াজটা তুলে দেয়া উচিত। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। এর কারণ শরীরে একটি শুকনো ঘা কাঁটার খোঁচা যেমন দগ্ধ করে তোলে, তেমনি মরণোত্তর পুরস্কার যাদেরকে দেয়া হয়, তার নিকটজনের হৃদয় এ পুরস্কার ক্ষত-বিক্ষত করে। এ কারণেই বলছি, এ পুরস্কারটা না দেয়াই উচিত। গত একুশে পুরস্কার যখন দেয়া হল তখন শহীদ আলতাফ মাহমুদের দুই মেয়েও এসেছিল তার বাবার মরণোত্তর পুরস্কার নিতে। তাদের হাতে যখন পদক দেয়া হয় তখন দু'মেয়েই অঝোর ধারায় কাঁদছিল। সেদিন ওদের কান্নায় অনুষ্ঠানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। এই প্রথম তারা বোধ হয় বুঝলো, তাদের বাবা নেই। কেননা, কোন মা-ই তাদের সন্তানকে বাবার অভাব বুঝতে দেয় না। যত কষ্টেই সে দিন অতিবাহিত করুক না কেন। জহিরের সন্তানরা ওদের বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে আমি বলতাম, তোদের বাবা অনেক দরে গেছেন। কাজ শেষ হলেই ফিরে আসবেন। বাবার প্রতি ওদের ফিলিংসটা এভাবেই তৈরী হয়েছিল। জহিরের ছেলে বিপুল যখন জহিরের মনরোত্তর পুরস্কার আনতে স্টেজে গেল, তখন বিপুল অঝোরে কেঁদে গায়ের শার্ট ভিজিয়েছিল। ও প্রথম উপলব্ধি

করেছে ওর বাবা নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে -এই মরণোত্তর পুরস্কার দিয়ে তার স্বজনদের নতুন করে কষ্ট দেয়া কেন? যে পুরস্কার জীবিতকালে দিতে পারেনি। সেই পুরস্কার এত বছর পর দিয়ে তার নিকটজনের মনে নতুন কষ্টের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এ জন্যেই বলেছি, মরণোত্তর পুরস্কার দেয়াই উচিত না। কেননা, যে চলে গেল, তো চলেই গেল। তাকে এখন আর স্বীকৃতি দিয়ে কি হবে? সে আর পাচ্ছে না। তাহলে কি ঐ অল্প কয়টা টাকা? ঐ টাকা দিয়ে কি তার সন্তানদের জীবন যাবে? যাবে না। তাহলে...? এই বিষয়টি আমাকে সত্যিই খুব কষ্ট দেয়। মরণোত্তর পুরস্কার পেয়ে আমরা আর কষ্ট পেতে চাই না। এ কারণেই বলেছি মরণোত্তর পুরস্কার বন্ধ করে দেয়া হোক।

ধরুন, আমি যদি এখন মারা যাই। তখন হয়তো রেডিও, টিভির খবরে আমার মৃত্যুর সংবাদ বলবে। কেউ কেউ হয়তো আমাকে দেখতে আসবে, কান্না-কাটি করবে। তখন হয়তো সবাই বলবে, আমি হেন ছিলাম, তেন ছিলাম। যা ছিলাম না তাও বলবে। আমি স্পষ্ট করে বলে গেলাম, আমার মৃত্যুর পর আমাকে যেন কেউ মরণোত্তর পুরস্কার না দেয়। আমাকে মরণোত্তর পুরস্কার দিয়ে আমার সন্তানদের কেউ যেন কষ্ট না দেয়। এটা সবার প্রতি আমার অনুরোধ। কেননা, আমি জীবিত থাকতে যে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি, মৃত্যুর পর সেই স্মৃতি দেয়ার দরকার নেই। আমাকে সারা দেশের মানুষ ভালবাসে এটাই যথেষ্ট। এদেশের মানুষ ভালবাসতে জানে। এটা আমি বহুবার দেখেছি। গত বছর আমি যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাই, তখন শত শত লোক আমাকে দেখতে গিয়েছিল। ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল পুরো কেবিন। এই যে আমার প্রতি এত মানুষের ভালবাসা, এটা কি আমার জন্য পরম পাওয়া না? আমি অবশ্যই এটাকে সবচেয়ে বড় পাওয়া মনে করি।

এখন আমার দিন কেটে যায় নানাভাবে, নানা আনন্দ, বেদনা, স্মৃতি রোমন্থনে। কখনো আমার সন্তান ও নাতীদের সঙ্গে কখনো বা কুকুরদের দেখাশোনা করে কিংবা মাইজভাণ্ডারীর লোকদের সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনা ও গান করে অথবা পুরানোরা অনেকে আসেন তাদের সঙ্গে গল্প করে। আমরা যারা পুরানো আছি। এফডিসি কিংবা রেডিওতে আমাদের ডাকা হয় না। আমরা পুরানোরা তো টাকা পয়সা চাই না। এফডিসিতে পুরানো সবাই এলে সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, কথা হয়, এটুকুই তো আমাদের আনন্দ, এটুকুই তো আমাদের চাওয়া। কিন্তু পুরোনোদের কোথাও ডাকা হয় না । রেডিও, টিভি, এফডিসি সব হযবরল হয়ে গেছে। এখানে আমার যত কষ্ট, বড় যন্ত্রণা। এই বেদনা নিয়েই বাকিটা জীবন চলে যাবে। তখন কোন অভিযোগ থাকবে না, থাকব না আমিও।